আশ্চর্য!

ফেব্রুয়ারী
১৯৬৬

একটি আশ্চর্য ফিল্ম ক্লাব ও অত্যাশ্চর্য রেডিও সাহিত্যে দুঃসাহসী সত্যজিৎ রায়ের অভিযান

এস,এফ, সিনে ক্লাবের উদ্বোধন

স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় আলোকচিত্র

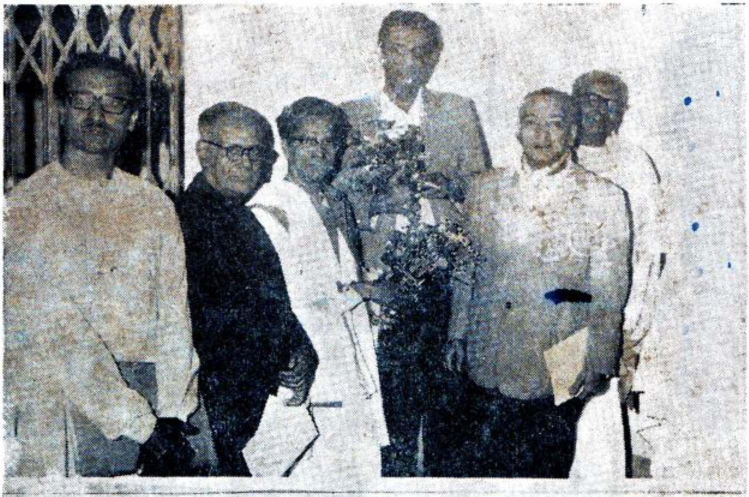

ওপরে

বাঁ দিক থেকে ঃ অদ্রীশ বর্ধন. কাফী খাঁ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মনোজ বসু।

নীচে

নীচের সারি ঃ বাঁ দিক থেকে—পাহাড়ী সান্যাল, নির্মলকুমার ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষ, মনোজ বসু। মধ্যের সারি—সস্ত্রীক সত্যজিৎ রায়।

এস,এফ, সিনে ক্লাবের উদ্বোধন
স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় আলোকচিত্র

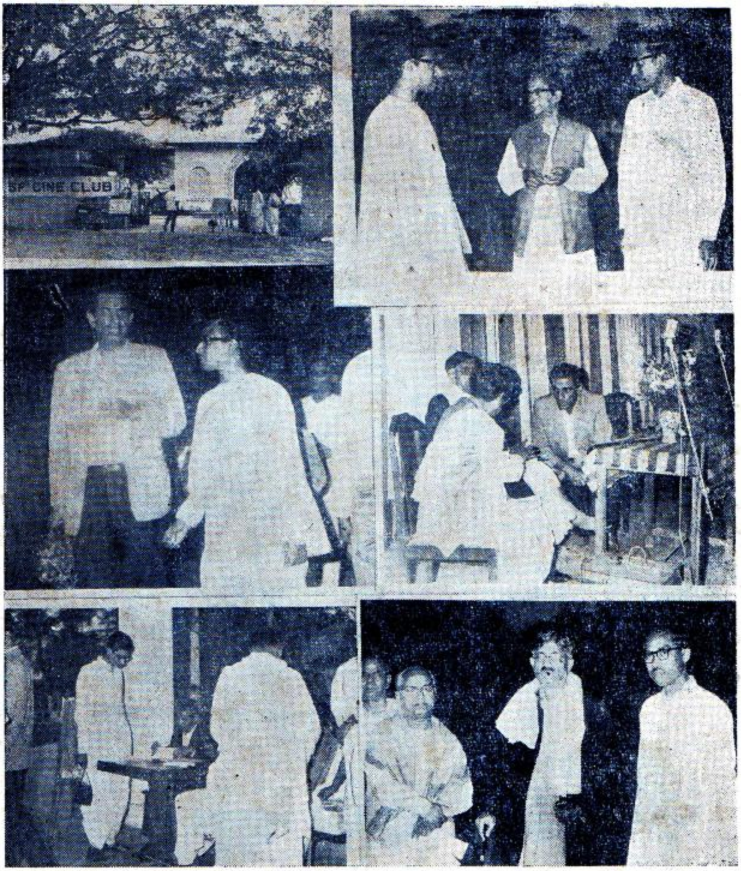

প্রথম সারি—প্রথম ছবি : অনুষ্ঠান প্রাক্কালে অ্যাকাডেমির প্রবেশ পথ।
দ্বিতীয় ছবি : গাড়ী থেকে নেমেই প্রেমেন্দ্র মিত্র। বাঁয়ে অদ্রীশ বর্ধন ও ডাইনে অসীম বর্ধন।

দ্বিতীয় সারি—প্রথম ছবি : অনুষ্ঠান শেষে ছবি নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করছেন সত্যজিৎ রায় ও অদ্রীশ বর্ধন।
দ্বিতীয় ছবি : অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঠিক আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তুষারকান্তি ঘোষ ও সত্যজিৎ রায়।

তৃতীয় সারি—প্রথম ছবি : অ্যাকাডেমির পোর্টিকোয় মেম্বারশিপ কার্ড নেওয়ার জন্যে ভীড় করেছেন সদস্যরা।
দ্বিতীয় ছবি : গাড়ী থেকে নেমেই তুষারকান্তি ঘোষ। বামে নির্মলকুমার ঘোষ ও ডাইনে অসীম বর্ধন।

মুখ
সুস্থ, স্বচ্ছ
ও
দুর্গন্ধমুক্ত রাখুন

সাধনা দশন কেবল আদর্শ দন্ত মঞ্জন নহে, ইহা বিশেষভাবে মুখ প্রক্ষালনের কাজও করে।

নিয়মিত ব্যবহার করিলে শুধু যে দন্তরাজি সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয় তাহা নহে, মুখ জীবাণুমুক্ত, নির্ম্মল ও প্রীতিকর গন্ধযুক্ত হয়।

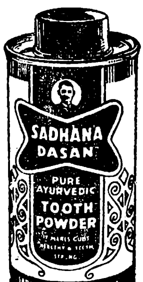

প্রত্যহ ব্যবহার করুন

সাধনা
দশন

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা
২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর
কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী
এফ. সি. এস্. (লণ্ডন) এম্. সি. এস্. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম্. বি. বি. এস্. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

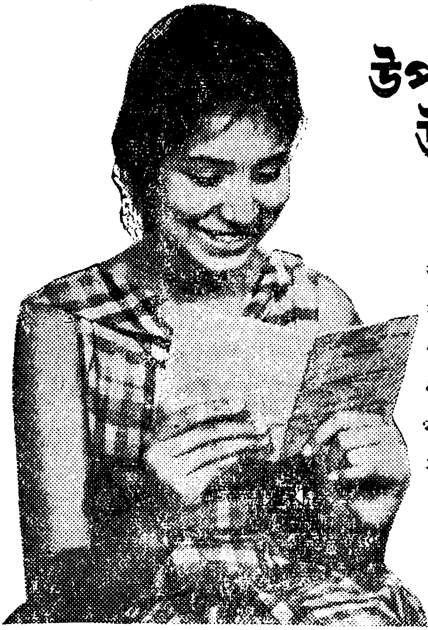

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে;' গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

জটিল জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ দেখাবে

সুখী মন

এমন উদ্দীপনাময় মাসিক পত্র আর একটিও নেই বাংলাদেশে,
যাতে মনের কথা, সাফল্যের কথা, সমস্যার কথা, প্রশ্নের জবাব পাবেন।
প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা ; বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা আড়াই টাকা মাত্র।

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

পোস্ট বক্স ২৫৩৯ ॥ কলিকাতা ১

৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

যুগলমূর্ত্তি
ত্রিগুণ তৈল

এজেন্ট - বটকৃষ্ট পাল

শতাব্দীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদোক্ত
কেশ তৈল

জাল নিবারণী সীলের উপর
এই ফটো দেখিয়া লইবেন

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৩৪

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

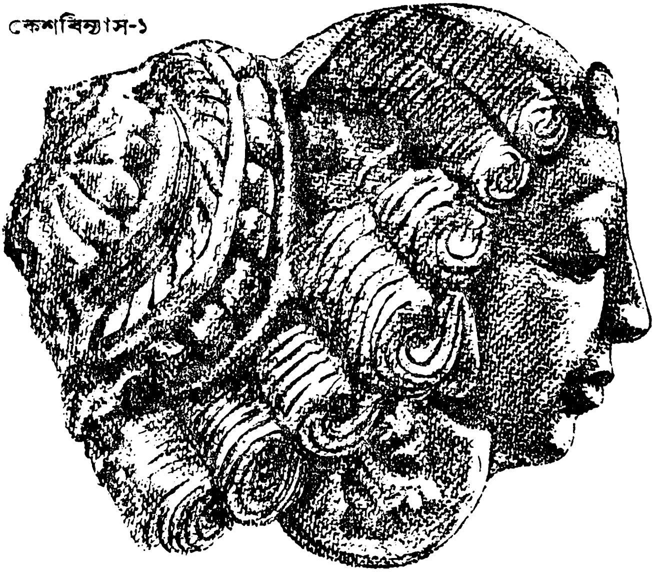

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই করে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

PENICILLINS

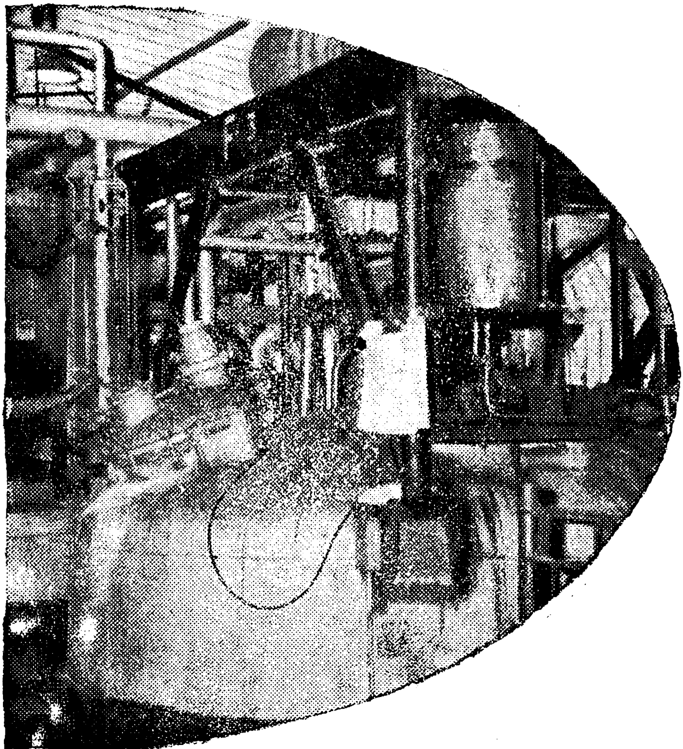

Our name is associated with Penicillins since 1950 Our experience in the research and production of Penicillins for about a decade have enabled us to put a big plant to suit tropical conditions and to ensure economic production of Penicillin.

Pioneers in the field of Medicines since 1934.

STANDARD PHARMACEUTICALS LTD. CALCUTTA-14

আনন্দের দিনে
অতিথিদের
লিলি
বিস্কুট
দিয়ে আপ্যায়িত করুন
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ

সুলেখা

প্রতিদিনের প্রয়োজনে

সুলেখা
ড্রইং এর
কালি

সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি

অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম

সিকুঢরিটি
সিলিং
ওয়াক্স

সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড

সুলেখা
ওয়ার্কস্
লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

Progressive/SW 23

আশ্চর্য

বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত কম দামে নিয়মিত
পেতে হলে এখুনি গ্রাহক হোন
বার্ষিক চাঁদা মাত্র ন'টাকা
গ্রাহক হলে উপহার পাবেন (১০৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

*

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌
৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

সারা পৃথিবী আনন্দিত

আশ্চর্য!

অভিনব পত্রিকার অভিনব কীর্তি !

বিস্ময়কর বিজ্ঞানভিত্তিক ও ফ্যানটাসি গল্পকল্পের মাসিক পত্রিকা

'আশ্চর্য!'-র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল
ভারতের তথা বিশ্বের সর্বপ্রথম
সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাব

"প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি সায়ান্স-ফিক্‌শ্যনের ভক্ত ; তাই এস. এফ. সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আমায় এতখানি নাড়া দিয়েছে। এ ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে আমি আনন্দিত ; এধরনের ক্লাব বোধ করি শুধু এদেশেই সর্বপ্রথম নয়, বিদেশেও আর নেই। ক্লাবের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এই কামনাই করছি সারা পৃথিবী থেকে বাছাই করা সেরা এস. এফ. ফিল্মের বহু মনোগ্রাহী এবং চিন্তা-উন্মেষক প্রদর্শনী যেন সভ্যরা দেখতে পান।"

সত্যজিৎ রায়
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 'আশ্চর্য!'

[এস. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্বোধনী স্মরণী-পুস্তিকা থেকে অনূদিত]

আগামী সংখ্যায়

[শ্রীসত্যজিৎ রায়কে লেখা ওয়াল্ট ডিজনীর চিঠির অনুবাদ]

'আশ্চর্য!' পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতিমাসে
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, পোস্ট বক্স ২৫৩৯, কলকাতা ১ কর্তৃক

এ সংখ্যায় থাকছে

শ্রীমতী (সম্পূর্ণ উপন্যাস) রণেন ঘোষ ৪৫

ছ ফুট উঁচু, তিনটে গোলাকার পা, চারটে হাত, ড্যাবডেবে চোখ···শ্রীমতী !

চাঁদের মেয়ে (ধারাবাহিক উপন্যাস) বিশু দাস ৩৫

ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজে চাঁদের রহস্য-জগত কেঁপে কেঁপে উঠলো !

বিক্রমজিৎ ফিরে এল ! (গল্প) অদ্রীশবর্ধন ৯

ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তৈরী ফোর্স ফিলডের গণ্ডীতে বন্দী হলো চার শয়তান !

ক্যুগেল ব্লিৎস (গল্প) ডক্টর দিলীপ রায়চৌধুরী ১৩

খনি অঞ্চলে ঘন ঘন বিস্ফোরণের কারণ যে এতটা সিরিয়াস কেউ বোঝেনি।

নকল গ্রহের যাত্রী (গল্প) অসীম কুমার বসু ২৯

সারা পৃথিবী জুড়ে পনেরো মিনিট রেডিও প্রচার স্তব্ধ হয়ে ছিল কেন জানেন ?

গর্গো (মেট্রো গোলডুইন-মেয়ারের সচিত্র কাহিনী) ৭৬

প্রাগৈতিহাসিক দানব 'গর্গো' কলকাতায় এসেছিল, তার ভেতরের গোপন খবর।

সময়ের প্রবেশ পথে (গল্প) বিশ্বদীপ ৮৬

দরজাটা খুলে একটু ওপরে উঠুন সিঁড়ি দিয়ে—ব্যাস, অতীতে চলে যাবেন !

রুট-৩৪ (গল্প) অগ্নিমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৯০

পাইলটদের হিপনোটাইজ করে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল লুট করা হতো !

তারার সীমানা ছাড়িয়ে (গল্প) অণাময় চট্টোপাধ্যায় ১০২

রাশিয়ার গোপন ল্যাবরেটরী ধ্বংস করার জন্যে গভীর ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছিল।

নিও-এটমিক এরা (গল্প) কিরণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ১২৭
একটি এ্যাটমাইসিন ইংজেকশন নিলেই সব সুখশান্তিতে দেহমন ভরে যায়।

নিয়মিত বিভাগ

অবিশ্বাস্য কিন্তু···অজিত কুমার বর্ধন ৮৩
সম্মোহনী এক টুকরো হাড়; ফটো তুললেই মৃত্যু—কিন্তু একেবারে সত্য!
নির্জলা বিজ্ঞান অজিত কুমার বর্ধন ৯৭
সর্দির নতুন আবিষ্কার; মাম করার কৌশল; চা একটি ওষুধ—জেনে রাখা ভাল!
এস. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্বোধন উৎসব ১০৬
'আশ্চর্য!' আর পাঠকমহল (চিঠিপত্র)
সায়ান্স-ফিকশ্যন তিন বছর আগে ও পরে (সমীক্ষা) ১০০
সায়ান্স-ফিকশ্যনের উপকারিতা (প্রবন্ধ) আর্থার সি ক্লার্ক ১০০
এস. এফ. সিনে ক্লাবের প্রতিষ্ঠায় সারা পৃথিবী উল্লসিত
রেডিও প্রোগ্রামে 'আশ্চর্য!' লেখকরা ১০৫
ছবিতে খবর চাঁদের দেশে কেমন মাটি! বেলুন বিহার···শূন্য-যোগ ১১৮
দি ইনক্রেডিবল্ শ্রিংকিংম্যান ১৩৫
এস. এফ. সিনে ক্লাবের আগামী ছবির সচিত্র গল্প

শিল্পী: শ্যামল সেন, অনিরুদ্ধ

আমাদের পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টারূপে
পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শিল্প উপদেষ্টারূপে চন্দ্রনাথ দে আছেন।
এঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬
সম্পাদক ঃ আকাশ সেন

সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের উদ্বোধন

এ সংখ্যার সবচাইতে বড় আকর্ষণ হচ্ছে ভারতের তথা বিশ্বের সর্বপ্রথম এস. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্বোধন সংবাদ। অনেকগুলি আলোক চিত্রও দেওয়া হল উৎসবের আবহাওয়া খানিকটা উপস্থাপিত করার জন্যে। কলকাতায় এত চলচ্চিত্র-সংস্থা থাকা সত্ত্বেও এ ক্লাব পত্তনের মূল উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, সায়ান্স-ফিকশ্যনকে শুধু ভারতে আমদানী করে বসে থাকলেই তো চলবে না, তাকে জনপ্রিয় করা দরকার। তাই যে তিনমুখো অভিযান তিন বছর আগে থেকে শুরু করেছে 'আশ্চর্য!' গোষ্ঠী—এ ক্লাব হল তারই সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক অংগ। মাসিক পত্রিকা, আকাশবাণী আর ছায়াছবি—এই তিন পথে এবার থেকে চলবে সায়ান্স-ফিকশ্যনের জয়যাত্রা। পথনির্দেশক হিসেবে রইলেন সাহিত্যের ও চলচ্চিত্রের দুই দিকপাল—শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সত্যজিৎ রায়।

*

অসীম কুমার বসু, অগ্নিমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অণাময় চট্টোপাধ্যায় ও কিরণ চন্দ্র ভট্টাচার্য 'আশ্চর্য!'র পৃষ্ঠায় এই প্রথম গল্প লিখলেন প্রথম হলেও গল্পগুলি উপভোগ্য।

'আশ্চর্য!' আর পাঠকমহল

বি. দাস, পুরুলিয়া

"মরণ ঘুম" উপন্যাসটির সাথে এইচ. রাইডার. হ্যাগার্ডের SHE উপন্যাসটির যথেষ্ট মিল আছে। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। লেখক যদি এটা স্বীকার করেন, তাহলে বলব লেখার শেষে হ্যাগার্ডের উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল।

সরোজ কুমার রায়, হাওড়া

[স্থানাভাব হেতু আপনার দীর্ঘ চিঠির আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা SF অনুবাদ সব সময়েই গ্রহণ করি এবং প্রকাশোপযোগী হলে প্রকাশ করি। সম্পাদক।]

তারাশংকর ভট্টাচার্য, ফতেসিংপুর নবীন সংঘ

বৈজ্ঞানিক প্রশ্নোত্তর বিভাগ ও সচিত্র সংবাদ আরো দেবার ব্যবস্থা করুন।

সুরজিৎ চৌধুরী, নাগাল্যাণ্ড

অন্যান্য মাসিক পত্রিকার কখনও ডাকের গণ্ডগোল হয় না, অথচ 'আশ্চর্য!'র বেলায় এটা হবার বিষয়টি তদন্তযোগ্য।

অসীম ঘোষ, গাংনাপুর, নদীয়া

'আশ্চর্য!' পাওয়া মানেই সব কিছু পাওয়া। দাম বাড়ুক ক্ষতি নেই, কিন্তু কলেবর বৃদ্ধি করুন।

রমেন সরকার, টালিগঞ্জ

জানুয়ারী সংখ্যাটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করে দিয়েছি। অদ্রীশ বর্ধনের 'জোঁক' গল্পটি মনে চমক লাগায়।

সমীর কুমার দাস, কলকাতা

শুনিয়াছি যে এস. এফ, সিনে ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুন্দরভাবেই পরিচালিত হইয়াছে।

চন্দ্রাবতী মজুমদার, শ্যামবাজার

আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের কোন চলচ্চিত্র সংস্থার উদ্বোধন অনুষ্ঠান এরকম ফলাও করে কাগজে ছাপা হয়নি, রেকর্ড সৃষ্টি করলেন সত্যজিৎবাবু, প্রেমেন্দ্রবাবু এবং অদ্রীশবাবু।

রামেশ্বর দাস, নিউ আলিপুর

এস. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে সংক্ষেপে 'গ্র্যাণ্ড সাকসেস' বললেই মনের আশ মেটে। ভাষণের নাম শুনলেই আমরা আঁৎকে উঠি। কিন্তু পর পর চারটি ভাষণ সেদিন আমরা রীতিমত উপভোগ করলাম। লেকচার সংক্ষিপ্ত হলেও যে কতদূর জোরদার হতে পারে, এস. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ।

ত্রিলোচন সান্যাল, বেহালা

সায়েন্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের প্রথম অধিবেশনে অদ্রীশবাবু তাঁর বিবৃতিতে বললেন, নতুন সভ্য আবার নেওয়া হতে পারে। সদস্য নেওয়া কি শুরু হয়েছে ?

সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাব

প্রেসিডেণ্ট : সত্যজিৎ রায়

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট : প্রেমেন্দ্র মিত্র

সেক্রেটারী : অদ্রীশ বর্ধন

বার্ষিক চাঁদা মাত্র ছ' টাকা : কোন প্রবেশ মূল্য নেই

অফিস : ৭৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা : ফোন ৩৪-৭২৭৪

[সময় : বিকাল ৪॥টা থেকে রাত ৮টা]

জনসাধারণের অনুরোধে

সীমিত সংখ্যক সদস্য নেওয়া আবার শুরু হয়েছে

এখনি আবেদন করুন

আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৬৬

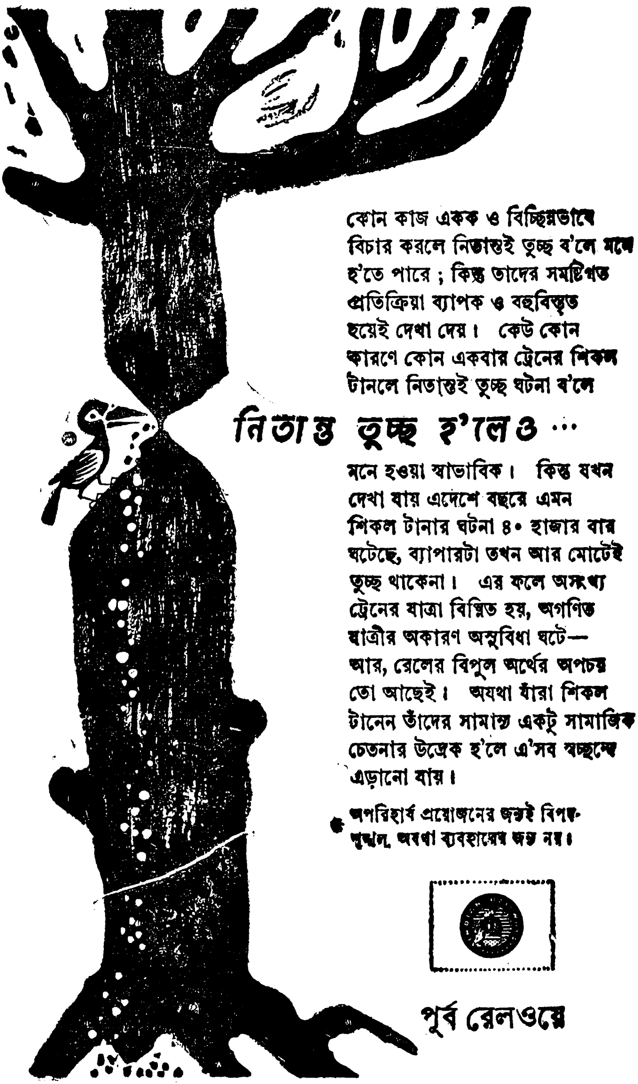
কোন কাজ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে
বিচার করলে নিতান্তই তুচ্ছ ব'লে মনে
হ'তে পারে ; কিন্তু তাদের সমষ্টিগত
প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত
হয়েই দেখা দেয়। কেউ কোন
কারণে কোন একবার ট্রেনের শিকল
টানলে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা ব'লে
নিতান্ত তুচ্ছ হ'লেও ...
মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন
দেখা যায় এদেশে বছরে এমন
শিকল টানার ঘটনা ৪০ হাজার বার
ঘটেছে, ব্যাপারটা তখন আর মোটেই
তুচ্ছ থাকেনা। এর ফলে অসংখ্য
ট্রেনের যাত্রা বিলম্বিত হয়, অগণিত
যাত্রীর অকারণ অসুবিধা ঘটে—
আর, রেলের বিপুল অর্থের অপচয়
তো আছেই। অযথা যাঁরা শিকল
টানেন তাঁদের সামান্য একটু সামাজিক
চেতনার উদ্রেক হ'লে এ'সব স্বচ্ছন্দে
এড়ানো যায়।
অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই বিপদ-শৃঙ্খল, অযথা ব্যবহারের জন্য নয়।
পূর্ব রেলওয়ে

OPEN

SAVINGS BANK ACCOUNT

YIELD 4% COMPOUND INTERFST

AND

TERM DEPOSIT ACCOUNTS

INTEREST 3% to 7½%

THE BANK OF INDIA LTD.

T. D. KANSARA
General Manager

S. K. CHAUDHURY
Regional Manager
(Eastern India Branches)

বিক্রমজিৎ ফিরে এল !

পাখী-দৈত্যের কুহক ঘণ্টা

অদ্রীশ বর্ধন

[ভূমিকাঃ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অভিযান চালিয়ে বিক্রমজিৎ ক্লান্ত। তাই সে দীর্ঘদিন দেখা দেয়নি 'আশ্চর্য!'র পাতায়। এদিকে তার ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে—ফরমাসের ঠেলায় প্রাণান্ত তার—নতুন অ্যাডভেঞ্চার চাই। একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। রেগেমেগে একদিন বিক্রমজিৎ তার ডাইরীটা গুঁজে দিয়ে গেল অদ্রীশ বর্ধনের পকেটে। বলে গেল—যা পারো এই থেকেই ছাড়ো ভায়া, আমাকে রেহাই দাও।—এই হল দীর্ঘকাল আত্মগোপন করার পর বিক্রমজিতের পুনরাবির্ভাবের মুখবন্ধ॥ সম্পাদক॥]

ছুটির ঘণ্টা বাজতেই বইপত্তর বগলে নিয়ে ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল শান্তনু সেন। স্কুল থেকে মিনিট খানেক হাঁটলেন তার বাড়ী।

আ-৩৭-২

গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে নিজের ঘরে এসে টেপ রেকর্ডার নিয়ে বসল শান্তনু।

টেপ রেকর্ডারটা শান্তনুর এক পেনফ্রেণ্ডের উপহার। সুদূর আমেরিকা থেকে বড়দিনের উপহার। পয়লা নম্বর টেপে আছে দুর্ধর্ষ বীর 'সবুজ লণ্ঠনে'র নতুন অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। 'সবুজ লণ্ঠন' বিক্রমজিতের মতই ওদেশে বিখ্যাত।

টেপটা চালিয়ে দিয়ে শুনতে বসল শান্তনু। সবুজ লণ্ঠন বলছে ঃ

রানজার বো, মায়াথ, গ্রোম আর লেয়ার—চার গ্রহের এই চার শয়তানকে গো-হারান হারিয়ে সুপারম্যান তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরের এক অন্য জগতে। উড়ন্ত উল্কাদের নিজের শক্তি দিয়ে টেনে এনে গড়লে এক নতুন গ্রহ। বন্দী করে রাখলে পৃথিবীর শত্রু সেই চার পিশাচকে।

আমার ম্যাজিক আংটি দিয়ে সে গ্রহে সৃষ্টি করলাম আবহাওয়া, জল আর মাটি। নির্মম নিষ্ঠুর চার বাসিন্দার যাতো কোনো অসুবিধে না হয়, তার সব ব্যবস্থাই করলাম।

সব শেষে সারা গ্রহটাকে মুড়ে দিলাম প্রচণ্ড শক্তির মোড়ক দিয়ে। আতীব্র সেই ফোর্সফিল্ডের মধ্যে দিয়ে প্রাণ নিয়ে বেরোনোর ক্ষমতা আমি ছাড়া আর কারো নেই জেনে মুখ কালো হয়ে গেল চার শয়তানের।

শেষ বারের মত দেখে নিলাম চারজনের মুখ। একজনের মাথায় যেন কুমীরের মুখ বসানো। আর একজনের মুণ্ডু তো নয়, ঠিক যেন একটা উল্টোনো বালতি। তৃতীয় জন কুহকিনী। কিন্তু মাথায় চুলগুলো হিন্দুদের মা দুর্গার চালচিত্তিরের মত ছড়ানো। আর চতুর্থজন অর্থাৎ রান্জার বো'র চেহারাটা অনেকটা শেরউডের রবিনহুডের মত। তবে সাংঘাতিক লিকপিকে। কনুই হাঁটু আর গলার হাড় ছুঁচোলো। নাকখানা সামনের দিকে এসে ওপর দিকে ওলটানো। আর চোখ? আমাদের মতই তার দুটি অক্ষিকোটর।

কিন্তু এক-একটি কোটরে বসানো এক-একটি পুঞ্জাক্ষি। অর্থাৎ মাছি আর পিঁপড়ের মতই তার চোখ। জানি না, রানজার বো'র পূর্বপুরুষরা মাছি আর পিঁপড়ে ছিল কিনা।

যাই হোক, চার শয়তানকে মহাশূন্যের সেই কারাগারে নির্বাসন দিয়ে আমি আর সুপারম্যান ফিরে এলাম পৃথিবীতে।

এদিকে মুক্তির জন্যে পাগল হয়ে ওঠে নির্বাসিতরা। যেভাবেই হোক, প্রাণীহীন এই গ্রহ থেকে বেরোতেই হবে। কিন্তু বেরোবো বললেই তোমার বেরোনো যায় না। সবুজ লণ্ঠনের তৈরী ফিল্ড ফোর্স বড়ই মারাত্মক জিনিস।

পুঞ্জাক্ষি রানজার বো বললে—"ম্যাজিক আংটির মধ্যে দিয়ে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সবুজ লণ্ঠন এই ফোর্সফিল্ড তৈরী করে গেছে। কাজেই আমরা যদি সকলে মিলে ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাই, তবে তার একার ইচ্ছাশক্তিকে নিশ্চয়ই হার মানাতে পারবো।"

কুমীরমুখো মায়াথ বললে—"চেষ্টার তো কসুর করিনি ভায়া কিন্তু পারলাম কই? এমন এক জব্বর ফোর্সফিল্ড বানিয়ে গেছে চিমসে সবুজ লণ্ঠন, বাকী জীবনটা এখানেই কাটাতে হবে দেখছি।"

চালচিত্তিরের মত চুলওলা গ্রোম বললে—"নিকুচি করেছে তোমাদের উইল ফোর্সের। কিচ্ছুই যখন করার নেই, তখন বকবকানি থামিয়ে ভাবো আর কি করা যায়।"

বালতির মত মাথাওলা লেয়ার দাঁত কিড়মিড় করে বললে—"সুপারম্যান নচ্ছারটাকে বাগে পেলে হাড়মাস আলাদা করে তবে ছাড়বো।"

আচম্বিতে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল রানজার-বো।

"দেখ! দেখ! ফোর্সফিল্ডে ফাটল ধরেছে!"

সত্যি তো! চকিতে সবাই চোখ তুলতেই দেখা গেল সেই অসম্ভব দৃশ্য। চারজনের মিলিত ইচ্ছাশক্তির জোরে দুর্ভেদ্য সবুজাভ

ফোর্সফিল্ডের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একফালি মহাশূন্য !

বন্ধু তিনজনের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই সাঁই করে পকেট থেকে ক্ষুদে এনার্জি-রডটা টেনে বার করল রানজার-বো। মাথার ওপর রডটা তুলে ধরে মুখটা ফাটলের দিকে ফিরিয়ে টিপে দিলে অ্যান্টি-গ্রাভিটি বোতামটা। সঙ্গে সঙ্গে রানজার বো'র আর কোনো ওজন রইল না। গ্র্যাভিটি অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ লোপ পেল তার পায়ের তলা থেকে।

তৎক্ষণাৎ হাউইয়ের মত সাঁ করে ফাটল লক্ষ্য করে ওপরে উঠে গেল রানজার-বো।

যাবার সময়ে চীৎকার করে বলে গেল—"চললাম ; বিদায় দোস্ত! এবার আমাকে আটকানোর ক্ষমতা আর কারো নেই। ফোর্সফিল্ডের ফাটলের মধ্যে দিয়ে চললাম আমি।"

হাঁ করে তাকিয়ে ছিল বালতিমুখো লেয়ার। তীরবেগে রানজার-বো শূন্যে উঠে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল বিকট গলায়—"আরে, আরে আরে! তুমি তো চললে, আমাদের হবে কি ?"

ককিয়ে উঠল গ্রোম—"সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে রানজার-বো।"

মাথায় ঘুসি পাকিয়ে লাফাতে লাগল—"শয়তান? বিশ্বাস-ঘাতক! চারজনে দোস্ত পাতিয়েছিলাম, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবো না। এখন দেখলে বেটার কাণ্ডখানা!"

লেয়ার বললে—"আমাদের তিনজনের ইচ্ছাশক্তির এমন ক্ষমতা নেই ফোর্স ফিল্ড কাটিয়ে উঠে যেতে পারি!"

বিদ্যুৎরেখার মতই ফাটলের মধ্যে বেরিয়ে গেল রানজার-বো। যাবার সময়ে বলে গেলে অট্ট হেসে—"সত্যিই তো! ভারী অন্যায়! বন্দী থাকার সময়ে তোমাদের মত বিটলেদের সঙ্গে দোস্তি পাতানোই হয়েছে অন্যায়। কিন্তু এখন আমি স্বাধীন। আমি মুক্ত। আমি আবার তোমাদের শত্রু। মূর্খের দল। পচে মরো সবাই মিলে—আমি চললাম। হাঃ হাঃ হাঃ।"

[ফাটল পথে উধাও হয়ে গেল পৃথিবীর মহাশত্রু রানজার-বো। তারপর? কি ভাবে প্রতিহিংসা নেবে সে? পৃথিবী কি টিঁকে থাকতে পারবে তার রোষবহ্নির সামনে? আগামী সংখ্যাতেই বেরুচ্ছে সেই লোমহর্ষক কাহিনী!]

আকাশের সেই এলাকাটা যেন হঠাৎ
বিচিত্র ফসফরাসের মত জ্বলতে লাগল !

ক্যুগেল ব্লিৎস

ডক্টর দিলীপ রায়চৌধুরী

সন্ধ্যেবেলায় হাওড়া স্টেশনটা একটা সমুদ্র হয়ে। একএকটা ট্রেনের গায়ে যেন মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, থ'র্ডক্লাশ কামরাগুলো প্লাটফর্মে ঢোকবার আগেই ভর্তি হয়ে যায়।

উচু ক্লাশের কামরাগুলো ত' রিজার্ভ করা, সে সব কামরায় হাত দেয় কার সাধ্য। কাজেই লোলুপ নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি !

অফিসের কাজে কোলকাতার বাইরে যাচ্ছি। পরের পয়সায় নবাবী করার এরকম সুযোগ আর কোথায় পাবো ! ভাবতেও ভালো লাগছে ভীড় পোয়াতে হবে না। কেবল রিজার্ভ করা ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরা খুঁজে নিতেই যা ধকল। এইটুকুতেই একেবারে গলদঘর্ম।

রেল কোম্পানীর লোকগুলোর মেজাজও যেন তেতে আছে। গাড়ীর নম্বর ও সিট নাম্বার বলেই খালাস, তারপর তোমরা মর হাতড়িয়ে!

কুলিগুলো না থাকলে আরো আধঘণ্টা ঘুরতে হত। কামরা ত পাওয়া গেল। এখন সহযাত্রী কে দেখি? লোয়ার বার্থখানা দেওয়া হয়েছে কোন এক ডক্টর এস রায়কে, ওপরের বার্থে বিছানা বিছিয়ে নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম কতক্ষণে আমার সহ-যাত্রী এসে পৌঁছান। মনে মনে ভাবলাম যদি খুঁতখুঁতে খিটখিটে লোক হয় তবে সমঝিয়ে দেওয়া যাবে আমি কে! একটু আগেই এসে পড়েছি। কুলিদের বিদায় দিয়ে একখানা রকেট সিরিজের বই নিয়ে বসলাম। রেলের নিয়ম অনুযায়ী আলবৎ রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত এখানে বসবো।

রেস্তোরাঁ গাড়ীর বেয়ারাটা এসে জিগ্যেস করে গেল খড়গপুরে খাবার দিয়ে যাবে কিনা। ট্রেনে চড়লেই আমার ভীষণ ক্ষিদে পায়। একটা ইংরেজী খানার অর্ডার দিয়ে হৃষ্টমনে গল্পের বইএ ডুবে গেলাম। কতক্ষণ বই পড়েছি জানি না। হঠাৎ খেয়াল হোল ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। সাড়ে সাতটা বাজতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী আছে, অথচ ডক্টর রায়ের দেখা নেই। যাক্, ভদ্রলোক তাহলে আর এলেন না। এখন বেশ হাত পা ছড়িয়ে যাওয়া যাবে রাত্তিরটা।

বাঁশি বেজে গেছে। লাল আলো হলুদ হয়ে সবুজ ছুঁয়েছে। এমন সময় কুলির মাথায় দুটো বড় বড় কাঠের বাক্স চাপিয়ে একজন ভদ্রলোক পড়ি-কি-মরি করে ছুটে আসছেন। চোখে চশমা, প্রশস্ত ললাট, কেমন যেন চেনা চেনা চেহারা! আরে এ তো আমাদের সেন্ট জেম্স কলেজের পুরাণের অধ্যাপক সুশোভন রায়। ওঁরা যখন করিডরে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কুলি দুটো দমাদম বাক্সগুলো আমার কামরায় নামিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল। সুশোভনবাবু কামরায় ঢুকে জানালা দিয়ে ওদের পয়সা প্লাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন! ঝন্ ঝন্ করে পয়সাগুলো প্লাটফর্মে ছড়িয়ে গেল।

গোটা ঘটনাটা এত হঠাৎ ঘটে গেল যে সম্বিত ফিরতে দেখি বাক্স টায় কামরাটা আধখানা জোড়া, তারি মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে শোভনবাবু কি যেন খুঁজছেন।

'স্যার কি হারালো?'

'অ্যাঁ, এই মনিব্যাগটা যে কোথায় ফেল্‌লাম, এই ত একুনি ওদের য়সা দিলাম। কি মুস্কিল, ওর মধ্যে যে টিকিট পত্তর সব আছে।'

'সে কি স্যার, এই ত' বাক্সের ওপর!'

'আরে সত্যিই ত'। কি বলে যে আপনাকে……কিন্তু আপনাকে মানে তোমাকে বড় বড় চেনা চেনা লাগ্‌ছে।'

'আমি সঞ্জয়, ১৯৫৬ সালে সেণ্ট জেম্‌স কলেজে আপনার ছাত্র ছিলাম।'

'তাইত! দেখ ভাই কিছু মনে কোর না তোমার চেহারা অনেক পাল্টেছে। বেশ মোটাসোটা হয়েছে। তা বেশ, এখন কি করা হয়?'—হঠাৎ সুশোভনবাবু ভাবালুতো আশ্রয় নিলেন।

'একটা সওদাগরী অফিসে কাজ করি। তাদের পয়সায় বোম্বাই যাচ্ছি কাজে। আপনি?'

'আমি যাবো ক্যাম্বেতে। বোম্বে থেকে গাড়ী বদল করে আহ্‌মেদাবাদ। সেখান থেকে আনন্দ—তারপর মিটার গেজের ট্রেনে ক্যাম্বে পুরো চার দিন যাবে রাস্তায়।'

এক নিমেষে যেন পুরো টাইমটেবলখানা মেলে ধরলেন আমার সাম্‌নে। তারপর গুজরাটের ঐ এলাকার ভূগোল, ভূসংস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি শুন্‌তে শুনতে কখন যে খড়্গপুরে পৌঁছে গেছে কে জানে।

'সাব্‌, খানা!'—দেখি বেয়ারাটা খাবার এনে হাজির করেছে। ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো, তখন যদি জানতাম আমার সহযাত্রী ডক্টর এস রায় হচ্ছেন পূজ্যপাদ অধ্যাপক সুশোভনবাবু, তবে ডবল খানা অর্ডার করতেও ত' পারতাম। সুশোভনবাবু বোধ হয় আমার

মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। বল্লেন, 'আরে আমি খেয়ে এসেছি হে, হ্যাঁ সত্যি বলছি। আমি বরং তোমার সঙ্গে এক পেয়ালা কফি খাবো।'

খাওয়ার পর কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে দুজনে বসেছি। জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে। দু একবার বিদ্যুৎ চম্‌কালো। অন্ধকার আকাশের বুক চিরে আলোর ঝিলিক দিয়ে গেল।

'জানালাটা বন্ধ করে দিই, স্যার?'

'উঁ, না, থাক না, বেশ ত ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে'—কেমন যেন অন্য-মনস্ক হয়ে কি একটা ভাবছিলেন সুশোভনবাবু—'কোনও দিন ভেবে দেখেছ সঞ্জয়, এই ঝোড়ো বিদ্যুৎ প্রবাহ কত মারাত্মক হতে পারে?'

'বজ্রাঘাতে প্রাণহানির কথা বলছেন স্যার না অন্য কিছু বিপদের কথা?'— যেন গল্পের গন্ধ পেলাম সুশোভনবাবুর কথায়।

'কিছুদিন আগে গুজরাটের ক্যাম্বে এলাকায় এক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। জানো বোধ হয় ওখানে পেট্রোলিয়াম তেল খননের কাজ চলেছে। এই রকমই এক আগলা-মেঘলা সন্ধ্যায় এক রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়ার আর জন দুই ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্ তেলের খনির পাশে একটি ছোট বাংলোয় তেল মেশানো কাদা পাথর পরীক্ষা করছিল। অকস্মাৎ সেখানে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বাংলোটা কে যেন এক ফুৎকারে চূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় তিন মাইল দূরে। মানুষগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দূরে যারা কাজ করছিল তারা বিস্ময় ও আকস্মিক শক্ কাটবার পর রিপোর্ট করেছে যে আকাশ থেকে যেন একটা জ্বলন্ত আগুনের স্তম্ভ তড়িৎ বেগে মাটিতে নেমে আসে। তারপর জানালা দিয়ে বাংলোটার ভেতরে ঢুকে যায়। তারপর চারিদিকে কেবল ধোঁয়া আর ধুলো।'

—ট্রেন চল্‌তে শুরু করেছে। এতক্ষণ খামখা গর্জনের পর আকাশ থেকে নেমেছে বৃষ্টির ঢল। জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। এরকম বাদলা আবহাওয়ায় আষাঢ়ে গল্প মন্দ জম্‌বে না, এই ভেবে বেশ আরাম করে বস্‌লাম, আমার মুখের ছোট বাঁকা হাসিটা বোধ করি মাষ্টার মশায়ের চোখ এড়ায়নি।

'ও, তুমি ভাবছো আমি গাঁজাখুরি গল্প বল্‌ছি। এরকম ঘটনা বিদেশেও ঘটেছে আগে। দাঁড়াও।'—সিটের ওপর রাখা ফোলিও ব্যাগটা থেকে উনি একতাড়া দেশী-বিদেশী খবরের কাগজ বার করলেন—

'এই যে, লণ্ডনের ডেলী মেল : তেসরা অক্টোবর ১৯৩৬ নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন শহরের উপকণ্ঠে একটি বাড়ীতে এক ভদ্র-লোক লক্ষ্য করেন এইরকম একটি অগ্নিপিণ্ড আকাশ থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে প্রথমে টেলিফোনের তার জ্বালিয়ে দেয়, তারপর একটি জানালায় আগুন ধরায় তারপর ঘরের ভেতরে এক বাল্‌তি জলের মধ্যে মিলিয়ে যায়। নিমেষে বাল্‌তির জল টগবগ্‌ করে ফুটতে থাকে। এমনকি কুড়ি মিনিট বাদেও ঐ জলে হাত ডোবানো যায় নি।'

সুশোভনবাবুর গলায় ঈষৎ উত্তেজনার আভাস দেখে আমি একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লাম : 'কে বল্‌লো আপনাকে আমি অবিশ্বাস করছিলাম। তেলের খনির চৌহদ্দীতে এত অসংখ্য কারণে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে যে আমি গোড়ায় অতটা সিরিয়াসলি ধরিনি। এখন অবশ্য একটু কৌতূহলী হয়ে পড়ছি। তাহলে আকাশের বজ্রস্তম্ভের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা তো সহজ নয়।'

'সহজ নয়ই তো। তাহলে আর আমাকে এত দৌড়াদৌড়ি করতে হবে কেন। এই ফটোখানা ত্থাখো আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর লস এ্যালামোয় ডক্টর ম্যাথিয়াস ফটো তুলে দেখিয়েছেন যে মাঝেমাঝে আকাশে একধরণের উড়ন্ত অগ্নিগোলক বা জার্মান

ভাষায় যাকে বলে ক্যাগেল ব্লিৎস দেখা যায়। এদের উৎপত্তির কারণ : বিদ্যুত প্রবাহে বাতাসের কোনো অংশ তড়িৎ বিশিষ্ট বস্তু কণায় রূপান্তরিত হলে সেই স্বল্প অংশ উচ্চশক্তি বিশিষ্ট প্লাজমায় পরিণত হয়।'

প্লাজমা কথাটা আমি আগেও শুনেছি। কিন্তু এইরকম একজন জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়ার কাছ থেকে রোজ তো আর শোনা যায় না। সুশোভনবাবু নিজের উৎসাহে বলে চলেছেন :

আমরা সাধারণভাবে কঠিন, তরল ও বায়বীয় তিন জাতের বস্তুর চরিত্র জানি। পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোটন, ইলেক্‌ট্রন দিয়ে তৈরী, সে গ্যাসই হোক আর শক্ত পাথরই হোক এখন গ্যাসের মধ্যকার ইলেকট্রনগুলো যদি খোসা ছাড়ানোর মত করে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় এবং তারপরও ঐ সব প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলো এক পেঁজা তুলোর মত অবস্থায় থাকে তাকেই আমরা বল্‌বো প্লাজমা। এর উত্তাপ অসাধারণ এবং শক্তিও অসীম।

পৃথিবীতে প্লাজমার তাপ সইবার মতো কোনো বস্তু নেই। তাই ল্যাবরেটরীতে প্লাজমা সৃষ্টি করতে গেলে অনর্থ ঘটবে। আগে তাপ সইবার মতো ধাতু কি পাথর খুঁজে বার না করতে পারলে কোন উপায় নেই। কাজেই ঊর্ধাকাশে ছাড়া প্লাজমা ত্নিয়ার চৌহদ্দীতে কখনও দেখা যায় নি।

রাত সাড়ে এগারোটায় গাড়ীটা টাটানগর পৌঁছানোর পর দেখি ঘুমে ত্নচোখ জড়িয়ে এসেছে। মাষ্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি উনিও ক্লান্ত। হবেই বা না কেন? সন্ধ্যের সময় যেরকম হুড়োহুড়ি করতে হয়েছে। অবশ্য ওঁর সঙ্গে গল্প করলে হয় তো আজ রাত অনায়াসে কেটে যেত। উনিই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন, বললেন : 'তাহলে এবার শুয়ে পড়া যাক সঞ্জয়। সারাদিন তোমার আমার ত্নজনেরই কম ধকল ও দৌড়াদৌড়ি যায় নি তো!'

উনি বালিশে মাথা ঠেকাতেই বাতি নিভিয়ে দিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, চোখ মেলে দেখি ট্রেইনটা দাঁড়িয়ে। রোদে চারিদিক ভরে গেছে। মাষ্টার মশাই গাড়ীতে নেই। তাড়াতাড়ি বাঙ্ক থেকে নেমে বুঝলাম বিলাসপুর স্টেশন। সকাল সাড়ে আটটা বাজে। চায়ের জন্য হাঁকডাক লাগিয়েছি এমন সময় সুশোভনবাবু কামরায় ফিরে এলেন। গম্ভীর মুখ, হাতে একখানা খবরের কাগজ।

'স্যার, ভীষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আপনার কিরকম ঘুম হোলো?'

সে কথার জবাব দেবার জন্য মাষ্টার মশায়কে বিশেষ ব্যগ্র দেখলাম না। চুপ করে এসে বস্‌লেন, তারপর খবরের কাগজখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

খবরের কাগজের প্রথম পাতার খবর দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। ওয়ার্ধার কাছে ত্রিকালেশ্বর বলে একটা জায়গায় কয়লার খনিতে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। ঠিক মেইন লিফটের সামনে হাওয়ায় গুঁড়ো কয়লার ঝড় উঠেছিল। হঠাৎ একটা বোমা ফাটার আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে ত্রিশজন শ্রমিক নিশ্চিহ্ন। লিফ্‌টের মুখটা জখম হওয়ায় প্রায় আড়াইশো শ্রমিক মাটির তলায় আটকা পড়েছে। আশপাশের সমস্ত জায়গা থেকে লোকেরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা দেখেছিল বিস্ফোরণের ঠিক আগেই যেন আকাশ থেকে উজ্জ্বল এক আলোক স্তম্ভ দেবতার অভিশাপের মত সরাসরি মাটির দিকে নেমে আসছে। কারো কারো মতে স্তম্ভটি দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ফুট হবে। বোম্বাই থেকে উদ্ধারকারী দল ওয়ার্ধা হয়ে ত্রিকালেশ্বরের দিকে ছুটছে।

মাষ্টারমশায় অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন ঃ আমাদের ট্রেইন কখন ওয়ার্ধা পৌঁছবে?'

'স্যার, সিডিউল্ড টাইম অনুযায়ী বিকেল সাড়ে পাঁচটায় নাগপুর,

তারপর সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ওয়ার্ধা। কিন্তু কেন, আপনি কি ভাবছেন······'

'হুঁ, না, ভাবছি না আর, ঠিকই করে ফেলেছি। ওয়ার্ধার এই ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর ভাল করে না নিয়ে ক্যাম্পে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। খনি এলাকাগুলোয় বার বার বিস্ফোরণ ঘটছে। এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা নয়।'

সাড়ে এগারোটায় গাড়ী রায়পুর পৌঁছালো। স্টেশন মাষ্টারের কাছে সুশোভনবাবু নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর দিল্লীতে একটা ফোনকরলেন। কি কথা হোলো জানি না। সামনে থাকাটা ঠিক শোভন মনে করিনি। একারণে ট্রেইনটা কিছু লেইট হয়ে গেল। আমাদের সহযাত্রীরা ইতিমধ্যেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। আমাদের ঘোরাঘুরি দেখে কিছু লোক সন্দিহান। আমরাই গাড়ীটা লেইট করে দিয়ে মজা দেখছি—এই ভাব।

'স্যার, কিছু খেলে হ'ত না?'

'হুঁ, ঠিক কথা; আজ রাত্তিরে কি জুট্‌বে ঠিক্ নেই। আচ্ছা, অর্ডার করেছ নাকি?'

'আমি আগে বুঝতে পেরেই দুটো ননভেজিটারিয়ান লাঞ্চ আনতে বলে দিয়েছি নেকস্‌ট স্টেশনে।' তারপর আরও কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ। বেগতিক দেখে আমি খবরের কাগজের অন্তপাতাগুলোর দিকে মন দিলাম। বোম্বে এলফিনষ্টোনে কি ছবি হচ্ছে, ভেনিস রেস্তোরাঁয় কে গান গাইছে এইসব খবর দেখে আবার প্রথম পাতায় এসে ফিরেছি। হঠাৎ একটা ছোট খবর দেখলাম। আরে! আগে ত জান্‌তাম না যে পরশু বোম্বাইএ একটা পার্শী ছুটির দিন। কাল শনিবার এগারোটায় ট্রেইন পৌঁছবে। তারপর রবি ও সোমবার কিছুই করার নেই ম্যারিন ড্রাইভে হাওয়া খাওয়া ছাড়া। মনটা খিঁচড়ে গেল।

মাষ্টারমশায় হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন—'আচ্ছা সঞ্জয়, তুমি তো

কেমিসট্রি পড়েছ ? অক্সিজেন গ্যাসের আয়োনাইজেশান পটেন্শিয়াল সম্পর্কে তোমার নিশ্চয়ই কিছু আইডিয়া আছে।'

একটু লজ্জিত হয়ে বল্লাম: 'স্যার, আইডিয়া তো আছে তবে জ্ঞান বড়ো একটা নেই !'

হো হো করে হেসে উঠ্লেন সুশোভনবাবু। এতক্ষণে জমা চিন্তার মেঘ যেন ভ্রু থেকে কিছুটা উড়ে গেল, 'বেশ বলেছ ! কিন্তু আমি কেবল ভাব্ছি সাধারণতঃ ঝোড়ো বিদ্যুতের প্রভাবে বাতাসে এক মেগাজুলের বেশী শক্তি সঞ্চারিত হয় না। কয়লাখনি কি তেলের খনিতে বিস্ফোরণ ঘটানোর মত শক্তি আসবে কোথা থেকে ?'

'স্যার, তাহলে বোধহয় ওগুলো ঝোড়ো আকাশের বিদ্যুত গোলক 'ক্যাগেল রিংস' নয়। তার চেয়ে মারাত্মক আর কিছু।'

'ঠিক ধরেছ ! চরিত্রে ওরা বিলেত কি এমেরিকায় দেখতে পাওয়া বিদ্যুত গোলকের মতই—প্লাজমায় গঠিত। কিন্তু বজ্র বিদ্যুৎ নয় তার চেয়ে আরও অনেক বেশী তীব্র রশ্মির বিকীরণে এই মারাত্মক প্লাজমাস্তম্ভ সৃষ্টি হয়েছে।'

'স্যার, আমি যতদূর জানি মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব এই ধরনের আয়ন সৃষ্টি করতে পারে, তবে কি...'

'না ! না ! কসমিক রে'র ব্যাপার এটা নয়। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব বড়ো বিস্তৃত ও ক্ষীণ। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে এই বিকীরণ স্বল্প এলাকা জুড়ে তীব্র ও বাঘের নখের মত তীক্ষ্ণ।'

গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এল। স্টেশন আসছে। এতক্ষণে বেশ খিদেও পেয়েছে, চাঙ্গাও লাগছে।

'তাহলে কি এটা প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক স্বাভাবিক ঘটনা নয় ?'

'উর্ধাকাশে গিয়ে ভাল করে সন্ধান না করে সঠিক বলবার উপায় নেই। তবু আমার মনে হয় এই ধরণের মারাত্মক বিদ্যুৎ স্তম্ভ মেঘ-লোকের ওপারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি—কোনও বুদ্ধিমান শত্রুর আমাদের শিল্পপ্রয়াসকে বাণচাল করে দেওয়ার অপচেষ্টা।'

স্টেশনে খাবার এসে গেল। খেতে খেতে বল্লাম 'মাষ্টার মশায়। আমিও আপনার সঙ্গে ওয়ার্ধায় ব্রেক জার্নি করছি।'

'সেকি হে। তুমি অফিসের কাজে যাচ্ছো। আমার এই পাগলামির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে কেন? না হে, ও কোরো না।'

বুঝলাম মুখে খুঁতখুঁত করলেও মাষ্টারমশায় একজন সঙ্গী পেলে নিতান্ত দুঃখিত হবেন না। বল্লামঃ 'স্যার যেরকম ভয়ের কথা বলছেন আপনাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। ভাগ্যচক্রে যখন দেখাই হয়ে গেল, দেখি ভাগ্য আমাদের দুজনকে কোন্ দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া কাল, পরশু দুদিন তো ছুটি। ত্রিকালেশ্বরে যদি আপনাকে আটকে যেতে হয় ত' আমি না হয় পরশু সন্ধ্যেবেলা বোম্বে চলে আসবো।'

'সে জন্য চিন্তা নেই সঞ্জয়। এয়ার ফোর্সের যে উড়োজাহাজ খানা এয়ার ভাইস-মার্শালের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছি সেখানা পেলে পরে আমরা দুজনেই প্লেনে বোম্বাই ফিরতে পারবো।'

'কিন্তু উড়োজাহাজ। ওয়ার্ধায় কি এয়ারস্ট্রিপ আছে?'

'সে চিন্তা আমাদের নয়। ওরা বন্দোবস্ত একটা কিছু করবে।'

রাত আটটা নাগাদ ট্রেইন ওয়ার্ধা পৌছালো। আমার সঙ্গে মালপত্তর বিশেষ কিছু ছিল না। মাষ্টারমশায়ের মোটঘাট, কাঠের বাক্স সব কুলিদের দিয়ে ধরাধরি করে নামালাম। অসম্ভব ভারী বলতে হবে। কি জানি কি আছে ওগুলোয়?

স্টেশন মাষ্টার ও তাঁর সঙ্গে এয়ারফোর্সের ব্লু ইউনিফর্ম পরা জনা দুই উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সুশোভনবাবু রায়পুর থেকে দিল্লীতে যে ফোন করেছিলেন তারই ধাকায় এত লোকলস্কর হাজির।

'প্রফেসার রায়, আমি এয়ার ভাইস মার্শাল সিন্হা। হ্যাঁ, আমিও বাঙালী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আপনাকে সবরকমে সাহায্য করতে বলেছেন। অবশ্য না বল্লেও আমি এগিয়ে আসতাম।

আপনি বোধ হয় জানেন না গোটা ক্যাবিনেট কিভাবে আপনার অনুসন্ধানের পিছনে উদগ্রীবভাবে তাকিয়ে আছেন। আর সেই সঙ্গে সমগ্র দেশ।'

সুশোভন বাবু বিনয়ী লোক। এইসব কথাবার্তায় একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি ধরণের প্লেন এনেছেন ?

'একটা টার্বোজেট ভাইকাউণ্ট আছে। আর ছোট একখানা জেটও আছে, আপনি কত ওপরে যেতে চান ?'

'বেশী নয়, ত্রিশ হাজার ফুট নাগাদ গেলেই হবে, তবে আপনাদের এ্যান্টি-এয়ার ক্রাফ্ট ও এ্যান্টি-মিশাইল গান্ বসানোর বন্দোবস্ত আছে ত ?'

'নিশ্চয়ই, সে ইনস্ট্রাক্শান আমরা আগেই পেয়েছি, কখন বেরোতে চান ?'

'আর দেরী করে কি লাভ কি। ভালো কথা, পরিচয় করে দিই। এই মিশনের স্পেশ্যাল সায়েন্টিফিক এ্যাডভাইজার ডক্টর সঞ্জয় বোস, কই, সঞ্জয়।' আমি কিছু বলবার আগেই আমার সম্পর্কে সুশোভন এয়ার ভাইস-মার্শালকে কত কি যেন বলে গেলেন। ভেবে আর কি হবে। সিকিউরিটির প্রয়োজনে এই পরিচয়ই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ।

আমরা স্টেশন থেকে এয়ার ফোর্সের জীপে করে সোজা রেষ্ট হাউসে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য। সেখানে জামাকাপড় বদলে সুশোভনবাবু ঐ ভারী কাঠের বাক্স একটা খোলালেন, ওর মধ্য থেকে কি সব যন্ত্রপাতি একটা কিট্ ব্যাগে ভরে নিলেন। সবশুদ্ধ্ পনেরো মিনিট হবে।

'মিষ্টার সিন্হা, উই আর রেডী। আপনারা উড়োজাহাজে কোথায় নামলেন ?'

'কাছেই একটা খেলার মাঠে মেকসিফট এয়ারস্ট্রিপ বানিয়ে নেওয়া

হয়েছে। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক্।'

রাত্রির অন্ধকারে আমাদের জীপ ছুটে চল্‌লো। ওয়ার্ধা শহরের বাইরে একটা বিরাট ফুটবল খেলার মাঠে বিমান দুটো পড়ে রয়েছে। আমরা তিনজন ছাড়াও আমাদের সঙ্গে পাইলট ক্যাপটেন গাদকারী রয়েছে। ভারী সুন্দর ভদ্রলোক এবং বেশ অভিজ্ঞও বটে।

ঠিক রাত দশটায় আমরা ছোট বিমানটায় উঠ্‌লাম। সিন্‌হা এবং সুশোভনবাবু পেছনের দিকে বস্‌লেন। ছোট এ্যান্টি এয়ার ক্রাফ্‌ট ও এ্যান্টি মিশাইল কামান দুটো ছাড়াও আরও কি সব অদ্ভুত যন্ত্রপাতি বাইরের দিকে মুখ করে রাখা হলো।

গর্জন করে জেট বিমান মাটি ছাড়িয়ে হাউইএর মতো সোজা ওপরে উঠে গেল। প্রথমে পাঁচ হাজার ফুট, পরে আরও ওপরে, দশ হাজার ফুট ওপরে এবং সেখান থেকে সোজা পশ্চিমমুখো চল্‌তে চল্‌তে আস্তে আস্তে ওপরে উঠ্‌তে লাগলো।

আমি বসেছিলাম পাইলট গাদকারীর ঠিক পেছনেই। মেঘ-লোকের মধ্য দিয়ে চলেছি। বোঝবার উপায় নেই কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কে যেন সবকিছু কালি দিয়ে মুছে দিয়েছে। কারো মুখে কোনও কথা নেই। খালি একটানা জেটের গর্জন। রেডারে দিক্ নির্ণয় করে বোঝা যাচ্ছে আমরা এখনও পশ্চিমেই যাচ্ছি। প্লেনের ভেতর প্রেশার বাড়ানোর বন্দোবস্ত থাকায় অস্বস্তি বিশেষ কিছু হচ্ছিল না। সবাই যেন একটু শ্লথ—কেমন ঘুম ঘুম ভাব।

সুশোভনবাবু কিন্তু একটা বিশেষ রেডার যন্ত্রের স্ক্রীনের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে কি যেন খুঁজছেন।

আমরা এতক্ষণে প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে উঠেছি। ক্যাপটেন গাদকারী হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্‌লেন: 'মিষ্টার সিন্‌হা, আমরা এইভাবেই কি সোজা এ্যারাবিয়ান সি'র দিকে যাবো, না এখন ফিরতে বলেন?'

সুশোভনবাবুই একথার জবাব দিলেন; 'ক্যাপ্‌টেন, আপনি

উত্তরমুখো আহ্‌মেদাবাদের দিকেই চলুন।'

আমাদের বিমান ডান দিকে মোড় নিলো। রাত প্রায় দেড়টা। এতক্ষণে অন্ধকার একটু তরল হয়েছে দিগন্তে বিস্তৃত আলোর ছোঁয়া লেগে।

মিঃ সিন্‌হা একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে বললেন: "আসুন, ডক্টর বোস, একটু গলাটা ভিজিয়ে নেবেন। ডক্টর রায়, আপনি যা খুঁজছেন তা আজ সারারাতই খুঁজতে হবে। কাজেই জেগে থাকতে হলে কফি'র মত জিনিষ হয় না।'

সুশোভনবাবু একমনে রেডারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

'শিগ্‌গির মিষ্টার সিন্‌হা কফি রাখুন। এদিকে আসুন,'—মাষ্টার মশায়ের গলায় চাপা উত্তেজনার আভাস।

রেডার পর্দার ওপরে দেখা যাচ্ছে প্রায় তিনশো মাইল উত্তরে একটা উড়োজাহাজ। চট্‌পট আমরা রেডিও মারফৎ বোম্বাই ও আহ্‌মেদাবাদের বিমানপোতের সঙ্গে যোগাযোগ করলুম।

'হেলো, বোম্বাই—আঙ্কলেশ্বরের ওপরে একটা উড়োজাহাজ, আমাদের কোনো ইউনিটের কি? কি বললেন, আমাদের কিছু নয়। আর ইউ পজিটিভ?'

'হেলো, আহ্‌মেদাবাদ—হ্যাঁ আমি ক্যাপ্‌টেন গাদ্‌কারী আপনাদের দিকেই আস্‌ছি। উত্তরে আঙ্কলেশ্বরের দিকে একটা প্লেন দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের ওখানকার কি? আপনারা কিছুই জানেন না! কোন খবরও পান নি।'

কয়েক মিনিট আমরা সকলে চুপ। তারপর সুশোভনবাবু বললেন: 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। উত্তরে এগিয়ে যান ক্যাপটেন গাদকারী। মিঃ সিন্‌হা পরশু ওদের টারগেট্‌ ছিল ত্রিকালেশ্বরের কয়লা খনি এলাকা আর আজ আঙ্কলেশ্বরের তেলের খনি এলাকা।'

কিন্তু ওরা কারা! মনের মধ্যে ভাবনা ও অজানা ভয় পাক খেতে লাগ্‌লো। উড়োজাহাজ ছুটে চলেছে। *প্রথমে যা ছিল রেডারে*

সামান্য একটা বিন্দু মাত্র তা ক্রমে রূপ নিতে লাগলো—বেশ বে
একটা বিমান হবে। আমাদের লক্ষ্য করেছে কি না জানি না
একটা এলাকা জুড়ে চক্রাকারে পাক খাচ্ছে।

আমরা বেশ কাছে এসে পড়েছি। উত্তেজনায় মাথা ছিঁ
পড়ছে। এখন কি হবে? ওদের মতলব কি?

অন্ধকার তখন যথেষ্ট পাতলা হয়ে এসেছে। আমরা বিস্ময়ে
লক্ষ্য করলুম সেই অচেনা উড়োজাহাজ থেকে তীব্র সার্চলাইটের মতো
রক্তাভ আলোর রশ্মি পড়তে লাগলো আকাশের একটা এলাক
জুড়ে। আকাশের সেই এলাকাটা হঠাৎ যেন বিচিত্র ফসফোরাসে
মত জ্বলতে লাগলো!

সুশোভনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: 'মাই গড! দে আর ইউজি
লেজার লাইট্‌নিং!!'

সে কথার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করবার আগেই দেখি সেই সার্চ
লাইটের আলো মিলিয়ে গেছে। তার জায়গায় একটা বৈদ্যুতিক
আলোক স্তম্ভ! চোখের নিমিষে কি যেন হয়ে গেল। সুশোভন
বাবু কি একটা যন্ত্রের বোতাম টিপ্‌লেন। অকস্মাৎ আলোক স্তম্ভটা
চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। সমস্ত আকাশটা তীব্র আলোয় ভরে গেল।
সঙ্গে সঙ্গে এ্যান্টিএয়ার ক্রাফ্‌ট কামানের একটানা ট্যাট্‌-ট্যাট-ট্যাট
শব্দ। মিঃ সিন্‌হা মোটেই সময় নষ্ট করেন নি। ওদের বিশালকায়
বিমানখানা গোঁৎ খেয়ে ঘুড়ির মতো ঝাঁঝরা হয়ে পড়তে আরম্ভ
করলো। মাটিতে পড়বার আগে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ করে ফেটে
পড়লো। সকালের শান্ত আকাশ সেই বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে
উঠলো।

আবার যখন সকলের সম্বিৎ ফিরলো তখন দেখি ক্যাপটেন
গাদ্‌কারী বোম্বাই মুখো চলেছেন।

মিঃ সিন্‌হা রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন: 'আমরা প্লেন-
টাকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি ডক্টর রায়। কিন্তু আপনাদের

কাছে অনুরোধ এখন আমার কাছে জানতে চাইবেন না প্লেনটা কাদের। ডিপ্লোম্যাটিক কারণে আপনাদের বলতে পারবো না। খালি জেনে রাখুন ওটা আমাদের সীমান্তের ওপারের শত্রুদের। কিন্তু আপনি কি কৌশলে আঙ্কলেশ্বর তেলখনিটাকে বাঁচালেন সেটা আমাদের জানবার অদম্য কৌতূহল হচ্ছে।'

সুশোভনবাবু বললেন: 'কিন্তু তার আগে আপনার ঐ কফি কিছুটা চাই।'

কফিতে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সুশোভনবাবু শুরু করলেন: 'আগেই বলেছি বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা শুনেই আমার মনে হয়েছে আমাদের শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই ঐ বৈদ্যুতিক আলোক স্তম্ভ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করেছে। তড়িৎ প্রবাহ আকস্মিকভাবে বাতাসের মধ্যে দিয়ে গেলেই বাতাসের অনু পরমানুগুলো আয়নে পরিণত হয়। মেঘ থেকে পৃথিবীতে তড়িৎ পরিচলনের ফলে এঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক "ব্যাপার ঘটে যখন তীব্র লেজার (LASER) রশ্মি ফোকাস করে বাতাসের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়।'

মিষ্টার সিন্হা বাধা দিয়ে বললেন: 'এই লেজার জিনিষটা ত' ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সুশোভনবাবু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন: 'আমারই দোষ। আমার মনে হয়েছিল আপনারা বোধ হয় জানেন।' লেজার বা ইংরাজী LASER কথাটা এসেছে Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation থেকে—সংক্ষিপ্ত করার জন্য আদ্যক্ষর নিয়ে। গোলাপী রুবী কৃষ্টালের ওপর আলো ফেললে তা থেকে তীব্র এক ওয়েভ লেংথের আলোক রশ্মি নির্গত হয়। এই লেজার রশ্মি ক্যামেরার সাটার দিয়ে আটকে রেখে হঠাৎ ছাড়লে অত্যন্ত তীব্র লক্ষ লক্ষ ওয়াট শক্তির আলোক রশ্মি খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও পাওয়া যায়। সেকেণ্ডের একশো কোটি ভাগের

এক ভাগ সময়ের মধ্যে এই তীব্র রশ্মি বাতাসের মধ্যে পড়লে এক অসহ্য উত্তপ্ত প্লাজমা সৃষ্টি করতে পারে।

'অবশ্য উপযুক্ত চৌম্বকক্ষেত্র ছাড়া এই প্লাজমাকে ধরে রাখা কষ্টকর। এবারেও ঐ প্লাজমার স্তম্ভ নিমেষে আঙ্কলেশ্বরের তেলের খনিতে বিস্ফোরণ ঘটাত। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি ডিগাউসিং করে চৌম্বকক্ষেত্র নষ্ট করায় প্লাজমা স্তম্ভ থেকে ছড়িয়ে পড়ে।

'ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ডিগাউসিং বা চৌম্বকক্ষেত্র নষ্ট করবার যন্ত্রপাতি সঙ্গে এনেছিলাম। আমার অনুমান এতটা ঠিক হবে ভাবতে পারিনি।

'কিন্তু মিষ্টার সিন্‌হা, প্রতিরক্ষা দপ্তরের সকলকে বলবেন আমরা যেন সজাগ থাকি। ওরা হয়তো আবার আসবে।'

দিগন্ত লাল হয়েছে। তাকিয়ে দেখি আমাদের বিমান সান্তাক্রুজ বিমানঘাঁটির ওপর চক্কর দিচ্ছে।

ভাল ভাল উপন্যাস পড়ুন .....

হৃদয়ের স্বাক্ষর জগদীশ প্রসাদ দাশ ৪৲

'সুন্দর'—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

'অপূর্ব'—লীলা মজুমদার

নভশির ঊর্মি গ্রেগরী মুখার্জী ৫৲

'মনে হয় চলচ্চিত্র'—আনন্দবাজার

'নূতনত্ব আছে'—বসুমতী

ঝড়ো ফুল সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য ৫৲

'উজ্জ্বল, জীবন্ত'—আনন্দবাজার

'সংস্কৃতিপূর্ণ'—অমৃত

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। ভিপি তে বই পেতে হলে ১৲ অগ্রিম পাঠাবেন।

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

সারা পৃথিবী জুড়ে হঠাৎ রেডিওগুলো বিকল হয়ে গেল···কিন্তু কেন?

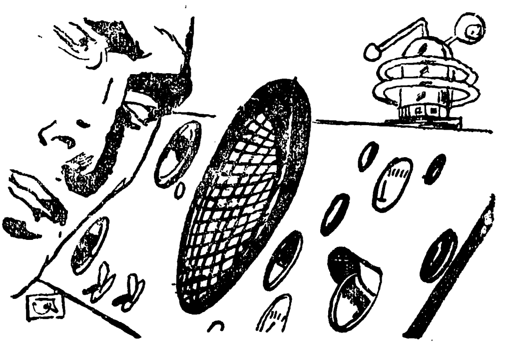

নকল গ্রহের যাত্রী

অসীম কুমার বসু

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, কিছুদিন আগে বেতার তরঙ্গের প্রচার কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেবল আমাদের দেশে নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ঘটনা ঘটেছিল। পুরো পনের মিনিট সারা পৃথিবীতে কোন রেডিও বাজে নি, কোন টেলিভিশন চলেনি, দূর দূরান্তরে টেলিপ্রিণ্টারের আওয়াজ বন্ধ হয়ে ছিল কিছুক্ষণ। কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও প্রথমে এই ব্যাপারটি নিয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামায় নি। কারণ রেডিও বা টেলিভিশন ষ্টুডিওতে, অথবা নিউজ এজেন্সীর অফিসে যন্ত্রপাতির গণ্ডগোলের ফলে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে, বিশেষ কোন দেশে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে একই সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে, তখন সমস্ত দেশের বৈজ্ঞানিক মহল এই বিষয় কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন।

সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে তার পরের দিন ট্রাঙ্ক টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিদ বৈজ্ঞানিক ডঃ হিউম্যান ওষ্টার, কলকাতার আবহাওয়া অফিস থেকে বেতার তরঙ্গ বন্ধের সময়ে আবহাওয়ার আয়নোস্ফেয়ারের অবস্থার রেকর্ড কিরকম ছিল, তা জেনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। কারণ স্বরূপ বলেছিলেন, তাঁর ধারণায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ সময়ের আয়নোস্ফেয়ারের অবস্থা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে, পৃথিবীব্যাপী এই রহস্যজনক ঘটনার সমাধান করা যাবে।

ডঃ ওষ্টারের এই অনুরোধ আমি রেখেছিলাম। আবহাওয়া অফিস থেকে খবর জেনে সঙ্গে সঙ্গেই তা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু আমি যতদূর জানি, এ ব্যাপারে কোনরকম সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেবল তিনিই নন, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছেও ব্যাপারটা এখনও রহস্যময়ই রয়ে গেছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সম্মেলনে এই রহস্যজনক ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু কোন রকম সন্তোষজনক সমাধানেই এসে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনাটি এতদিন আমার কাছে রহস্যময় ছিল এবং সেইরকম রহস্যময় থেকে যেত, যদি না কিছুদিন আগে নয়াদিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডঃ সুইনটর্নের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেত। সেদিনই রাত্রের প্লেনে তাঁর আমেরিকায় ফিরে যাবার কথা। এই হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার দুজনেই বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম। পরস্পরের সঙ্গে চেনা পরিচয় ও বন্ধুত্ব অনেক দিনের। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়েছে। কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক এক শান্তি মিশনের মার্কিন প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে তিনি এদেশে এসেছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলেও সমস্ত মানব জাতির উন্নতি ও সুযোগ সুবিধার জন্য

তাঁর সস্নেহ মন সবসময়েই সচেষ্ট ও উন্মুখ ছিল।

দেখা হতে বাচ্চা ছেলের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর হোটেলে। লক্ষ্য করে দেখছিলাম তাঁর চুলে তখন পাক ধরেছে, চশমার লেন্স হয়েছে আরও পুরু। কিন্তু এসব কিছুই তাঁর চেহারার সৌম্য প্রকাশকে ফুল্ল করতে পারে নি। হোটেলে এসে দরজা খুলে বেয়ারাকে কফি দিয়ে যেতে বললেন ডঃ সুইনটর্ন। অভিজাত ধরণের হোটেল, চারিদিক উজ্জ্বল আলো ও দামী আসবাবপত্রে ঝকমক করছে। দেশবিদেশের আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকেই সবকিছুর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ডঃ সুইনটর্ন বললেন, মিঃ বোস, প্লেনের সময় রাত্রি সাড়ে এগারোটা সুতরাং অন্ততঃ রাত আটটা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে গল্প করা যাবে।

আমি বললাম, নিশ্চয়, সে তো খুব আনন্দের কথা! কতকাল পরে আপনার সঙ্গে দেখা।

ডঃ সুইনটর্ন যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, কিছুটা থেমে আস্তে আস্তে বললেন, সত্যি অনেকদিন পরে। চারিদিকের সমস্ত কিছুই ক্রমশঃ পাল্টে যাচ্ছে। এই সময়েয় মধ্যে পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয়েছে।

আমি বললাম, পরিবর্তন ?

ডঃ সুইনটর্ন বললেন, হ্যাঁ মিঃ বসু, পরিবর্তন। পৃথিবীতে সব সময়েই ত কত পরিবর্তন হচ্ছে। কালকের পৃথিবী যা ছিল, আজ তা থেকে কিছু আলাদা। গত বছরের পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর তুলনা করতে যান, দেখবেন চারিদিকে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবীর দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শিগ্‌গীরই এমন একদিন আসবে, যখন মানুষের জয়ের যাত্রা পৃথিবী ছাড়িয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিস্তৃত হয়ে

পড়বে। মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহে বাস করবে মানুষ। আর সব চেয়ে আশ্চর্য কি জানেন, সেই গ্রহগুলির কোন কোনটি হবে মানুষের নিজের তৈরী।

আমি বললাম, আপনি কি বলছেন মিঃ সুইনটর্ন!

সুইনটর্ন বললেন, হ্যাঁ মিঃ বসু, প্রকৃতির গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়ে মানুষ তৈরী করবে কৃত্রিম উপগ্রহের মত তাঁর নিজের তৈরী গ্রহ, আর সেই গ্রহে বাস করবে মানুষ নিজে।

মিঃ সুইনটর্নকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল, তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কফির ট্রে হাতে বেয়ারা প্রবেশ করলো। সেই সময়ের জন্য উত্তেজনাকে দমন করে নিলেন ডঃ সুইনটর্ন। তারপর বেয়ারা চলে যেতে, পটে চিনি নাড়তে নাড়তে বললেন, মিঃ বসু, কথাগুলো আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অসম্ভব মনে হচ্ছে না নিশ্চয়। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের সম্বন্ধে আপনিও কিছু অবগত আছেন। আচ্ছা, কিছুদিন আগে সারা পৃথিবীতে মিনিট পনেরোর জন্যে বেতার তরঙ্গের প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে কথা স্মরণ করতে পারেন, মিঃ বসু?

আমি বললাম, নিশ্চয়, এ বিষয়টি নিয়েই ত' আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো ভেবেছিলাম।

মৃদু হাসলেন ডঃ সুইনটর্ন। বললেন, যাক্ তা' হ'লে প্রশ্ন করবার আগেই আপনি এ বিষয়ে কিছু একটা উত্তর পেয়ে যাবেন। ব্যাপারটি অবশ্য খুবই গোপনীয়। কিন্তু আমি জানি এ বিষয়টি সম্বন্ধে অন্ততঃ আপনাকে কিছু বলা যেতে পারে।

সঙ্গের ছোট এটাচি কেসটা খুলে একটা কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফ বা'র করলেন ডঃ সুইনটর্ন। কাগজের ঢাকনা খুলে আমার সামনে ফটোটি প্রসারিত করে বললেন, দেখুন ত মিঃ বসু, ফটোটি দেখে ব্যাপারটি সম্বন্ধে কোন একটা আইডিয়া করতে পারেন কিনা।

ফটোটিতে বিরাট বিরাট রকেটের মত কয়েকটি জিনিস দেখা

যাচ্ছিল। সেই রকেটগুলি থেকে নির্গত তীব্র ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আশেপাশের অনেকটা জায়গা অস্পষ্ট হয়ে আছে বলে মনে হল। আমি বললাম, ফটোটি দেখে এটিকে যতদূর সম্ভব একটা বড় রকেট স্টেশনের ছবি বলেই মনে হচ্ছে।

ডঃ সুইনটর্ন বললেন, অনেকটা ঠিক বলেছেন, মিঃ বসু, এটা একটা রকেট স্টেশনই বটে, তবে সাধারণ নয়। গত বছর ১৭ই অক্টোবর তারিখে বেতার তরঙ্গ যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন এখান থেকেই মানুষের তৈরী প্রথম গ্রহটিকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। অথবা বলা যেতে পারে, এই উৎক্ষেপণের সময় উৎপন্ন প্রচণ্ড কম্পনশীল তীব্র শব্দ তরঙ্গের জন্যই সারা পৃথিবীর বেতার তরঙ্গের প্রচার সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই উৎক্ষেপণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি বটে, তবে শিগ্‌গীরই এমন একদিন আসছে, যখন মানুষের প্রয়াসের এই স্বপ্ন সার্থকভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে।

ডঃ সুইনটর্নের কথাকে তখনও কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। এই বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য কি? পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান মানুষদের বাসস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা? অথবা বসবাসের জন্য সেই বিরাট কৃত্রিম গ্রহ তৈরী করা হবে কি ভাবে? ডঃ সুইনটর্নকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে মৃদু হেসেছিলেন ডঃ সুইনটর্ন, বলেছিলেন, সব কথা এই মুহূর্তে কেবলমাত্র মুখে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে জেনে রাখুন, কৃত্রিম গ্রহের বিভিন্ন অংশগুলি মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী ও আরামদায়ক করে তৈরী করা হচ্ছে। খণ্ড খণ্ড এই অংশগুলি উৎক্ষেপণের পরে, এই পৃথিবী থেকেই টেলিওয়েভ কন্ট্রোলের সাহায্যে একত্রিত করা হবে। পরীক্ষামূলক ভাবে এই ব্যবস্থা সফল হলে মানুষের বসবাসের বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। কারণ বর্তমানের দূরপাল্লার সপ্তাহান্তিক জেটফ্লাইটের মত তখন সেই কৃত্রিম গ্রহ থেকে পৃথিবীতে যাতায়াতের

জন্য গ্রহ-গ্রহান্তরে ভ্রমণ ব্যবস্থার সুবিধা থাকবে। দরকার মত পৃথিবীতে এসে অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নিয়ে যাওয়া চলবে।

মিঃ সুইনটর্ন আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, বেয়ারা এসে তাঁর হাতে একটা স্লিপ দিল। স্লিপটা পড়ে মিঃ সুইনটর্ন বললেন, মাফ করবেন, মিঃ বসু। আমাদের ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত কথাবার্তার জন্য আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে একবার ফরেন মিনিসট্রিতে যেতে হবে। আপনি কিছু মনে করবেন না। এ বিষয়ে আমাদের গবেষণা আরও এগোলে আশা করছি, ভবিষ্যতে আপনাকে যথাসময়ে বিস্তৃতভাবে আরও কিছু জানাতে পারব। তা ছাড়া এ ব্যাপারে আপনার সাহায্যও আমাদের কিছু প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সঙ্গে পরে নিশ্চয় আবার দেখা হবে।

ডঃ সুইনটর্নকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সহাস্যে করমর্দন করলেন ডঃ সুইনটর্ন। ঘড়িতে অনেকক্ষণ আটটা বেজে গিয়েছিল। ডঃ সুইনটর্নের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলের বাইরে ব্যস্ত রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডঃ সুইনটর্নের বিচিত্র বিবৃতি মনে পড়লো। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান দ্রুত সামনে এগিয়ে চলেছে।

সুখী মন সুখী মন সুখী মন সুখী মন সুখী মন সুখী মন

সুখী মন **কে না পড়তে চায়!** সুখী মন

সুখী মন **সুখী মন** সুখী মন

সুখী মন বাংলাভাষায় একমাত্র মাসিক পত্রিকা সুখী মন

যা সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ দেখাচ্ছে!

সুখী মন প্রতি সংখ্যা ২৫ প. ॥ বার্ষিক ২.৫০ প. সুখী মন

সুখী মন অ্যাল্‌ফা-বিটা ॥ বক্স ২১৩৯ ॥ কলিকাতা সুখী মন

সুখী মন সুখী মন সুখী মন সুখী মন সুখী মন সুখী মন

চাঁদের অজানা রাজ্যে

দুঃসাহসিক অভিযান ও আবিষ্কারের

ধারাবাহিক কল্পকাহিনী

চাঁদের মেয়ে

বিশু দাস

॥ ১৩॥ মৃত্যুর রাজ্যে ॥

মানো-তির প্রাসাদ থেকে বেরিয়েই ছুটলাম রাজবাড়ীর দিকে। নি-লা-রার সেদিনের ব্যবহারের পর আর রাজপ্রাসাদে যাইনি, সুতরাং আজ আবার রাজার সাথে সাক্ষাত করতে হ'লে কি কি নিয়ম মেনে চ'লতে হবে কিছুই জানি না। তবু সাহসে ভর ক'রে রাজপ্রাসাদের ফটকে এসে দাঁড়ালাম। প্রহরীদের কমাণ্ডারকে ব'ললাম অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে রাজার সাথে সাক্ষাৎ ক'রতে চাই এক্ষুণি। রাজা কিগরাতির সাথে সাক্ষাত না হ'লে রাজকন্যা নি-লা-রার সাথেও দেখা ক'রতে হবে।

"একটু অপেক্ষা করুন, রাজার কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছি," বললো সে।

অনেকক্ষণ পর লোক ফিরে এসে জানালো যে রাজা সাক্ষাত ক'রতে চান আমার সাথে। ভেতরে ঢুকে দে'খলাম রাজা কিগ-রাতি আর নি-লা-রা পাশাপাশি ব'সে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে। আমি ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন আমার দিকে। নি-লা-রা কিন্তু নির্বিকারভাবে ব'সে রইলো।

তিনি কি যেন ব'লতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই নি-লা-রা ব'লে উঠলো, "তুমি এখানে কেন এসেছো বিদেশী গুপ্তচর?" সঙ্গে সঙ্গে তিনদিকের তিনটে দরজা দিয়ে ঢুকলো তিনজন সশস্ত্র প্রহরী। আমিও খাপ থেকে তরোয়াল খুলে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

"আমি এসেছি রাজা এবং রাজকন্যার জীবন রক্ষা করার জন্যে।"

রাজা আমাকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "তার মানে? কোন সাহসে তুমি আমার সামনে তরোয়াল খুলে দাঁড়াও!"

চীৎকার ক'রে ব'ললাম, "মানো-তির লোক আসছে আপনাকে হত্যা ক'রতে। তাই আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছি। এই

তিনজন মানো-তির লোক।” বলেই আমি তাদের মাঝে ঝাঁপিয়ে প’ড়লাম। একটু পরেই রাজার প্রহরীরা এসে তিনজনকে গ্রেপ্তার ক’রলো।

তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করা আমার অভ্যাস ছিলো কারণ বিমান-বিদ্যালয়ে পড়বার সময় এটা আমাদের শিখতে হ’য়েছিলো। নি-লা-রার বিশ্বাস পাবার জন্যে প্রাণপণে লড়লাম আমি। অবশ্য সে কি ভাবছে না ভাবছে তাতে আমার খুব বেশী আসে যায় না, অনেকটা প্রতিক্রিয়ার বশেই ল’ড়েছিলাম।

নি-লা-রা একপাশে দাঁড়িয়ে স্থাণুর মত। অবিশ্বাসের দৃষ্টি তার চোখে। নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস ক’রতে পারছে না।

নি-লা-রা চীৎকার করে উঠলো, “তোমার পেছনে শত্রু, বজ্রপাণি!”

পেছন ফিরতেই দেখি একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। বেচারা তৈরী হবার আগেই আমার তরোয়াল সোজা চ’লে গেলো ওর হৃৎপিণ্ড ভেদ ক’রে। ঠিক সেই সময়ই দশ বারো জন লোক এসে হাজির হ’লো ঘরের মধ্যে। আমার দিকে নজর না দিয়ে তারা সোজা ছুটে গেলো রাজার দিকে। আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই ছ’টা তরোয়াল ঢুকে গেলো তার বুকের মধ্যে, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। নি-লা-রার ঠিক পেছনেই একটা দরজা। রাজা কিগরাতি মাটিতে প’ড়ে যেতেই নি-লা-রা ফিস্ ফিস্ ক’রে ব’ললো, “তাড়াতাড়ি চ’লে এসো বজ্রপাণি, না হ’লে আমাদেরও মরতে হবে এদের হাতে।”

ঘর ভর্তি শত্রুসৈন্যের সাথে যুদ্ধ করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়, তাছাড়া রাজাই যখন মারা গেছেন তখন আর যুদ্ধ ক’রেই লাভ কি?

দুজনে দরজার ওপাশে যেতেই নি-লা-রা দরজাটা বন্ধ ক’রে দিলো।

"তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, বজ্রপাণি। তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো। আমার বাবার জীবন বাঁচাবার জন্যে তুমি নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন ক'রেছিলে। তোমাকে অবহেলা ক'রে খুব অন্যায় ক'রেছি আমি," ছলছল চোখে ব'ললো নি-লা-রা।

"আমি সব কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি শোননি। অবশ্য তোমার এতে কোন অন্যায় নেই, তুমি জানবেই তা কেমন ক'রে?"

"আমি ভেবেছিলাম মানো-তি তোমাকে ওর দলে টেনে নিয়েছে, তাই..."

"একটা কথা তোমার জানা উচিৎ ছিলো নি-লা-রা যে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনদিনই দাঁড়াবো না আমি। চিরকাল তোমার পাশেই থাকবো।"

"সে কথা আমি কেমন ক'রে জানবো ব'লো?"

হঠাৎ ওর লতাপল্লবিত দেহটাকে জড়িয়ে ধ'রে পাতলা গোলাপের পাঁপড়ির মত দুটি ঠোঁটের স্পর্শ পাবার অদম্য ইচ্ছে জাগলো মনে। কেন যে হঠাৎ মনে ইচ্ছেটা জাগলো ব'লতে পারবো না। খুব ভয় হ'য়েছিলো ওর জন্যে। নেশাটা কেটে যেতেই একটুখানি বোকার মত হাসি ফুটলো আমার মুখে।

"চলো নি-লা-রা, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। জায়গা খুঁজে বার করি।"

"বেশ চলো তাহলে ওপরেই যাই। সেখানে আমাদের বিশ্বস্ত প্রহরীরা আছে। ওরা আমাদের জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত সব সময়।"

মানো-তি যখন লোকজন নিয়ে প্রাসাদে ঢুকেই পড়েছে তখন আর যুদ্ধ করে লাভ কি? কিন্তু এই প্রাসাদে কি ঐ কয়েকজন সৈন্য ছাড়া আর তোমাদের আর বিশ্বস্ত কেউ নেই?

"হাজার খানেক প্রহরী আছে মোট। তার মধ্যে কিছু বোধ হয় এতক্ষণ মারা গেছে, বাকীরা সব ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে।"

সবচেয়ে উঁচুতলায় উঠতে দেখা হ'লো শ' খানেক রাজভক্ত সৈন্যর

সাথে। নি-লা-রাকে দেখেই তারা চীৎকার ক'রে উঠলো, "আমরা আমৃত্যু সংগ্রাম করবো রাজকন্যার জন্যে!"

"কিন্তু এই একশ সৈন্য মানো-তির অগণিত সৈন্যর বিরুদ্ধে কতক্ষণ যুদ্ধ কর'বে?" বললাম আমি।

কমাণ্ডারকে বললাম, "দশ বারোজন লোক পাঠিয়ে দাও চতুর্দিকে যত সৈন্য আছে যেখানে, সবাইকে একজায়গায় এসে জমা হ'তে বলো। তারপর বাইরে গিয়ে রাজকন্যার বিপদের কথা জনসাধারণকে জানাতে ব'লবে তাদের। মানো-তি আসবার আগেই আমরা রাজকন্যাকে সিংহাসনে বসাতে চাই। যে সৈন্যদল আমাদের আগে আছে তারা মানো-তির সৈন্যদের অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। ইতিমধ্যে লোকজন এসে যাবে।"

কমাণ্ডার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নি-লা-রার দিকে চাইলো।

"বজপানি যা ব'লবে তাই হবে", ব'ললো নি-লা-রা।

আমরা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ছুটলাম দরবারের দিকে। সবে নি-লা-রাকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছি এমন সময় মানো-তি এসে ঢুকলো সেখানে।

আমাদের সৈন্যদের আদেশ দিলাম দরজাগুলো আগলে রাখবার জন্যে। তারপর মানো-তিকে ব'ললাম, রাজা কিগরাতি মারা গেছেন এবং আমরা রাজকন্যাকে সে তির সিংহাসনে বসিয়েছি।

"দাঁড়াও।" চীৎকার ক'রে উঠলো—সে, "রাজকন্যা সিংহাসনে ব'সবে আমার সাথে, একা সে এ অধিকার কিছুতেই পেতে পারে না।"

প্রহরীদের ব'ললাম, "এই দেশদ্রোহীকে বন্দী ক'রো।" বিপদ বুঝে মানো-তি একলাফে পালিয়ে গেলো ঘরের বাইরে। কিন্তু আমি জানতাম ও আবার ফিরে আসবেই। তবে ইতিমধ্যে আমাদের সব সৈন্যরা এসে গেলে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে ওদের।

আমার ধারণাই ঠিক হ'লো, একটু পর মানো-তি প্রচুর সৈন্য

নিয়ে এসে হাজির হ'লো। প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে যেতে লাগলো আমাদের সৈন্যরা। মৃতদেহ জমে স্তূপ হ'য়ে গেলো। মানো-তির সৈন্যরা কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারলো না। পেছন থেকে সৈন্যদের খাবার দাবার দিতে লাগলাম আমরা, কারণ যুদ্ধ যে কত-ক্ষণ চলবে তার কোন ঠিক নেই। আমাদের সৈন্যরা দরজার আড়াল থেকে যুদ্ধ ক'রছে ব'লে ম'রছে কম।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ শোনা গেলো বাইরে। আস্তে আস্তে শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগলো কাছে। শেষে বুঝতে পারলাম অসংখ্য মানুষের মিলিত চীৎকারই এর কারণ। শহরের জনসাধারণ দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্যে।

তারা সবাই একসাথে চীৎকার ক'রে উঠলো, "দেশদ্রোহী মানো-তি নিপাত যাক।"

নি-লা-রা সিংহাসন থেকে নেমে ব'ললো, "জনতার ইচ্ছার জয় হোক। তারা যাকে চাইবে সে-ই হবে সে-তির রাজা।"

পেছন থেকে কারা যেন ব'লে উঠলো, "রাজকুমার মানো-তি সে-তির রাজা হবে।"

অবাক হ'য়ে নি-লা-রার মুখের দিকে চাইলাম। "এরা কি সব তোমার বিরুদ্ধে?" জিজ্ঞেস ক'রলাম ওকে।

আমাদের সৈন্যরা ব'ললো, "এসব মানো-তির লোকদের কাজ। ওরা জনসাধারণের মনে অবিশ্বাসের বিষ ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। তবে রাজা কিগরাতির দয়া এবং বদান্যতার কথা নিশ্চয় ওরা ভোলেনি এখনও।"

"জনতার ইচ্ছার জয় হোক", আবার ব'ললো নি-লা-রা।

"জনতা কোথায়, এরা মূর্খের দল, নইলে একটা শয়তানের কথায় চলে। যতক্ষণ আমাদের একজনও বেঁচে থাকবে সে-তির সিংহাসন ততক্ষণ রাজকন্যা নি-লা-রার," ব'ললো আমাদের কমাণ্ডার।

মানো-তির সৈন্যরা লোকজন ঠেলে ভেতরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমরা প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলাম। যতক্ষণ আমাদের একজনের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমরা ল'ড়ে যাবো।

কমাণ্ডার বললো, "রাজকুমার বো-জোর-পাণির পাশে দাঁড়িয়ে আমরা আমরণ যুদ্ধ ক'রবো। আমাদের শেষ সৈন্যটি মরবার আগে রাজকন্যার বুকে বসিয়ে দেবো তীক্ষ্ণ ছোরা।"

নি-লা-রার দিকে তাকিয়ে ওর নরম বুকে ছুরির আঘাতটা কল্পনা ক'রে সমস্ত শরীরটা আমার কেঁপে উঠলো আতঙ্কে। না, না, তা হ'তে পারে না। নি-লা-রাকে বাঁচাবার অন্য কোন উপায় বার ক'রতেই হবে; যদিও জানি যে নি-লা-রার কাছে প্রাণের চেয়ে ইজ্জতের দাম অনেক বেশী। জন দশ বারো সৈন্য নিয়ে মানো-তি আমাদের ব্যূহ ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকে প'ড়লো। আমি ততক্ষণে নি-লা-রার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

খোলা তরোয়াল নিয়ে মানো-তি ছুটে এলো আমাকে আক্রমণ ক'রতে। নি-লা-রা চীৎকার করে আমাকে ব'ললো, "আত্মসমর্পণ কর, বজ্রপাণি। ওদের সাথে লড়াই করা বৃথা। তুমি কেন শুধু শুধু সে-তির জন্যে জীবন দিতে যাবে?" তারপর, মানো-তিকে উদ্দেশ্য ক'রে ব'ললো, "ওকে ছেড়ে দাও মানো-তি, আমি জনমতের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তোমাকেই সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।"

"না, দেশদ্রোহী মানো-তি কখনই সিংহাসনে ব'সতে পারে না," চীৎকার করে উঠলাম আমি।

মানো-তির সৈন্যরা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়ে'ছে। মানো-তির সাথে আরম্ভ হ'লো আমার অসিযুদ্ধ। আমি যে কোনদিন এমন ক'রতে পারবো স্বপ্নেও ভাবিনি। সুযোগ বুঝে এক সময় তার বুকে সোজা চালিয়ে দিলাম আমার তরোয়াল। তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার ক'রে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়লো মানো-তি। বার দুয়েক ওঠবার চেষ্টা ক'রে শেষে স্থির হ'য়ে গেলো ওর দেহ। কিছুক্ষণের

জন্যে শত্রুমিত্র সবাই হতভম্ব হয়ে চুপ ক'রে রইলো মানো-তির আকস্মিক মৃত্যুতে।

একটা বিস্ফোরণের শব্দে সম্বিত ফিরে এলো সকলের। ঘর দুয়ার থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো। পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগলো সকলে। আবার একটা শব্দ শোনা গেলো। গৃহযুদ্ধের কথা ভুলে গেছে সবাই তখন।

পর পর বিস্ফোরণ হ'য়েই চললো। ভয়ে রক্তশূন্য হ'য়ে গেছে সবার মুখ।

"চল নি-লা-রা, দেখে আসি বিস্ফোরণটা হচ্ছে কোথায়।"

"চলো, সবচেয়ে উঁচু মিনারটা থেকে সমস্ত শহরটা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানেই যাই।" কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে এগিয়ে চ'ললাম আমরা। যাবার আগে প্রহরীদের সব ফটকগুলো বন্ধ ক'রে দিতে ব'ললাম।

নীচে লোকজন ছোটাছুটি আরম্ভ ক'রেছে। চতুর্দিক ধোঁয়ায় অন্ধকার। পোড়া বারুদের গন্ধও ভেসে আসছে বাতাসে। অনেক ঘর বাড়ী ভেঙে প'ড়েছে ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের আঘাতে।

বিস্ফোরণ শহরের ভেতর থেকে ঘটানো হ'য়েছে ব'লে মনে হ'লো না। নিশ্চয়ই ওপর থেকে কেউ কিছু ফেলেছে। একটা লুকোনো জায়গা থেকে ওপরের দিকে তাকাতেই বুঝলাম আমার অনুমানই ঠিক। ওপরে জ্বালামুখের চতুর্দিকে বহু লোক জমা হ'য়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। নি-লা-রা এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে।

"এরা তো দেখছি সব বিবিসোন, সে-তি আক্রমণ ক'রতে এসেছে। আগেও কয়েকবার সে-তি আক্রমণ ক'রেছে ওরা, কিন্তু বিশেষ সুবিধে ক'রতে পারেনি। এবার দেখছি নতুন অস্ত্র নিয়ে এসেছে!"

ওপরে দেখলাম পর পর সাজানো রয়েছে অনেকগুলো প্রচণ্ড বিস্ফোরক, যে কোনো মুহূর্তে নীচে এসে প'ড়বে। "ওরা সমস্ত

শহরটা ঘিরে ফেলেছে, নি-লা-রা। তোমার সৈন্যরা বিস্ফোরকের ব্যবহার জানে?" জিজ্ঞেস ক'রলাম আমি।

"আমাদের পৌরাণিক গ্রন্থে অবশ্য ঐ জাতীয় অস্ত্রের উল্লেখ আছে। আগে না-ভা-তে তৈরীও হ'তো, কিন্তু সে শিল্প আজ লুপ্ত হ'য়ে গেছে", জবাব দিলো নি-লা-রা।

কমাণ্ডার ছুটে এসে খবর দিলো, "একজন কালকার দূত এসেছে শহরে। সে আপনার সাথে দেখা ক'রতে চায়। একমাত্র আপনিই পারেন শহরটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।"

"ওদের এত বড় সাহস!" রাগে লাল হ'য়ে উঠলো নি-লা-রার সুন্দর মুখ।

"লোকটা ব'লছে ওদের রাজা সমস্ত না-ভার একচ্ছত্র অধিপতি। অন্য জগত থেকে এসেছে সে। আপনাকে নাকি ভালো ক'রে চেনে এবং অনেকদিন থেকেই ভালবাসে।"

"লোকটার এত বড় স্পর্ধা! কি নাম তার?"

"মুচুকুন্দ। সে নাকি রাজার রাজা।"

আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলো নি-লা-রা।

"মুচুকুন্দ", নিজের মনেই গুন গুন ক'রে ব'ললো সে।

"এবার বুঝতে পারছি, এতদিন ধ'রে ঐ প্রচণ্ড বিস্ফোরক সে তৈরী ক'রেছে এখানে ব'সে, তারপর খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হ'য়েছে এখানে বিবিসোনদের সাহায্যে।"

দূতকে নি-লা-রা ব'লে দিলো, "যাও তোমাদের রাজাকে গিয়ে ব'লো আমরা মরতে রাজী, তবু তার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রবো না।" তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললো, "এখন কি করি ব'ল তো, বজ্রপাণি? কি নিয়ে মুচুকুন্দের ঐ সাংঘাতিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রবো?"

"এ সব অস্ত্র আমিও তৈরী ক'রতে পারি, কিন্তু তাতে তো অনেক সময় লাগবে। তুমি বরং সে-তির নাগরিকদের ব'লে দাও

যদি ওরা পারে সকলে মিলে জ্বালামুখের ওপরে গিয়ে ওদের আক্রমণ করুক। সম্ভব হ'লে আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও কেড়ে নেবে ওদের কাছে থেকে, তবেই বাঁচবার আশা আছে।"

অনেকক্ষণ চিন্তা করলো নি-লা-রা। তারপর ধীরে ধীরে কমাণ্ডারের দিকে চেয়ে ব'ললো, "যাও। প্রত্যেক সে-তিকে অস্ত্র সজ্জিত হ'তে ব'লো। আমি সকলের সামনে গিয়ে ব'লবো সে-তির ভাগ্য নির্ভর ক'রছে তাদের ওপর। যাও।"

[পরবর্তী সংখ্যায়ঃ "মরুৎ মহাকাশযান"]

রাধাগোবিন্দ দাস রচিত

একটি চমৎকার প্রাণময় উপন্যাস

তিন অঙ্কে এক অঙ্ক

দীর্ঘ বিস্তারিত এই উপন্যাসটি সমাজ-সাংস্কৃতির আলো-হাওয়ার মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প কথার সবটুকু সমারোহ এনেছে বার করে। এর পাতায় জীবনের রকমারী রঙ ঠিকরে পড়েছে, গল্প বলার ভঙ্গীটি হয়েছে সরস, বাস্তব, জীবন্ত, আর তার ফলেই মনোহারী। পাঠককে ছুটিয়ে নিয়ে যায় শেষ পৃষ্ঠায়।

দাম টা ৫'৫০ (ডাকব্যয় স্বতন্ত্র)

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেন্‌স্‌

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

কালো ত্রিকোণাকৃতি চকচকে পদার্থের দেহ···
গম্বুজাকৃতি মাথা···ছ ফুট উঁচু···তিনটে গোলাকার পা···
চারটে হাত···ড্যাবডেবে চোখ···শ্রীমতী ! শ্রীমতী ! শ্রীমতী !

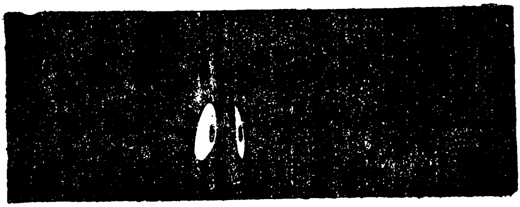

শ্রীমতী

রণেন ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি আনন্দপুর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। অবশ্য এটা জানতাম যে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে আনন্দপুর বলে একটা গ্রাম আছে। আর না জানারও কারণ আছে। আমি বদলি হয়ে আসা পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যার ফলে গ্রামবাসীদের আমাদের মানে পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে।

সেদিন সকালে অফিসে ঢুকতেই দেখি একটা খাম পড়ে আছে আমার টেবিলে। ছাপ দেখে বুঝলাম হেডকোয়ার্টার থেকে আসছে। চিঠি পড়ে কিন্তু কিছুই মানে বুঝলাম না। শুধু লেখা আছে আনন্দপুর গ্রাম সম্বন্ধে যেন সতর্ক থাকি। অনেক কিছু অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে সেখানে।

কোন কিছু বলার আগে আমাদের পরিচয় দেওয়া ভাল। আমি সম্প্রতি এই থানায় বদলি হয়ে এসেছি। এখানে এসে দেখলাম আমার বন্ধু তরুণ সেন এখানকার এসিস্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর। তরুণ সেনের একটু পরিচয় না দিলে তার চরিত্রের অনেকটা বাদ থেকে যাবে। লম্বায়

প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, বলিষ্ঠ গড়ন। মাথার চুল কোঁকড়ানো। গায়ের রং ফর্সা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা কল্পনাপ্রবণ। এক কথায় বলা যায় সুপুরুষ। অবশ্য তার একটি বিশেষ দুর্বলতা আছে। জীবজন্তুদের অসম্ভব ভালবাসে সে। তাদের দুঃখদুর্দশা দেখলেই বলে, "এদের যারা কষ্টে রাখে, আইন করে তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার।" তাই ওর বন্ধুবান্ধবদের মতে চারটে পা এবং কিছু লোম দেখলেই তরুণ মুগ্ধ হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে তার ব্যবহার দেখলে মনে হয় তারাই তরুণের প্রকৃত বন্ধু।

সুতরাং চাকরি ছাড়াও তার একটা কাজ হচ্ছে জীবজন্তুদের পরিচর্যা করা এবং যদি আইনের মধ্যে পায় তো জীবজন্তুদের যারা কষ্ট দেয় তাদের শাস্তি দেওয়া।

যাক্, কিছুক্ষণের মধ্যেই আনন্দপুর থেকে কয়েকজন লোক এল আমার কাছে। তরুণ তাদের বসতে বলল।

একে একে তাদের বক্তব্য শুনতে লাগলাম। আর তরুণ নোট বইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলো টুকতে আরম্ভ করলো।

প্রথমে নৃপেন বোস বললেন "সেদিন খুব ভোরে আমি দুধ নিয়ে পাশের গ্রামে যাচ্ছি। তখনো চাঁদ ডোবেনি। পূবের আকাশ অল্প অন্ধকারে লাল হচ্ছে। স্পষ্ট দেখলাম আমার রাস্তার কিছু দূরে কি যেন দুটো দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। না, দেখতে কোন ভুল হয়নি। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা ঠিক শেয়ালের মতো। অথচ স্পষ্ট দেখলাম লেজ নেই। আবার দুপাশ থেকে হাতের মতও যেন কি দেখা যাচ্ছে। উচ্চতায় বোধ হয় ৫ কি ৬ ফুট হবে। তারা হেলেদুলে হেঁটে এসে রাস্তায় ওপর দাঁড়ালো। এবার চোখে পড়লো বুক পেট একদম গোল মসৃণ। মাথায় কোন চুল নেই। কিন্তু শিং-এর মতো কি যেন রয়েছে। চোখ দুটো গোল গোল, বেশ বড়ো আর যেন বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তারপরেই আমার দিকে এগিয়ে এল ওরা।

আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।"

আরও অনেকে দেখেছে বলল। আর তাদের বর্ণনার সঙ্গে নৃপেনবাবুর পার্থক্যও বেশ। অনেকে বলল যে হাত দুটো ঠিক মানুষের হাতের মতো। আমি বললাম "আচ্ছা এমনও তো হতে পারে ঐ রকম বিদকুটে পোষাক পরে কেউ আপনাদের ভয় দেখিয়েছে।" কিন্তু তারা মানতে রাজি হলো না। এর উত্তরে যা বললো তাতে সত্যিই চিন্তিত হলাম। উত্তেজিত ভাবে একজন বলল—"আপনি কি বলছেন? মানুষ ভয় দেখাচ্ছে। এই তো সেদিন রামদা ওদের তাগ করে গুলি ছুঁড়লো। স্পষ্ট সবাই দেখলো গুলি বুক ভেদ করে চলে গেল। মরা দূরে থাক, দৌড়ে ওরা বনের মধ্যে ঢুকে গেল।"

"স্যার, আপনারা একবার নিজের চোখে দেখবেন চলুন। তাহলে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারবেন"—একজন অনুরোধ করল।

মোদ্দা কথা হল, এই ভূতুড়ে ব্যাপারে গ্রামের সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে কেউ আর রাস্তায় বেরোয় না। সন্ধ্যে-বেলায় যেন গভীর রাত নেমে আসে আনন্দপুরে। গভীর রাতে জানালা দিয়ে তাকালেই ঐ দুই মূর্তিকে প্রায়ই দেখা যায় যেখানে সেখানে সুতরাং গ্রামবাসীরা এবিষয়ে আমাদের সাহায্য চায়।

আমি বললাম—"কিন্তু তারা যদি কোন ক্ষতি না করে থাকে তো তাদের বিরুদ্ধে কি করা যাবে তো বুঝি না!" তরুণ এবার মুখ খুলল। জোরালো গলায় বলল—"আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আনন্দপুরে আমাদের যাওয়া দরকার। গ্রামের লোকেরা দু'দুটো প্রাণীর ওপর সমানে অত্যাচার চালাচ্ছে। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে।"

কথা শুনে ভদ্রলোকেরা বেশ রেগে গেলেন। রেগেমেগেই আরো অনেক কথা বললেন। গ্রামবাসীরা একদিন ঐ জীব দুটোকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু আনন্দলোকে এসে তাদের আর দেখতে পায়নি।

"কে থাকে ওখানে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"বাড়ীটা ডাক্তার অনিরুদ্ধ মিত্রের। ডাক্তারবাবু বিয়ে করেননি। একাই থাকেন সেখানে গত চার বছর ধরে"—বলল একজন।

এর পরেই সন্তোষবাবু যা বললেন তা মূল্যবান। সন্তোষবাবুর বক্তব্যের সারমর্ম এই: একদিন সন্তোষবাবু ভদ্রলোকের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন। তখন বেশ রাত। আকাশে তারা মিটমিট করছে। হঠাৎ তাঁর মনে হলো ডাক্তারবাবুর বিরাট নতুন হল ঘরটার থেকে যেন আলো দেখা যাচ্ছে। অনেকদিন থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল ডাক্তারবাবু আবার একটা কেন নতুন ঘর করলেন। তাই এই সুযোগে তিনি জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন।

"আমি হলপ করে বলতে পারি, প্রথমেই ঘরের একদিকে রাখা একটা বিরাট লোহার খাঁচা ছিল। খুব মোটা মোটা লোহার শিক দিয়ে তৈরী। ভেতরে কি আছে দেখতে পেলাম না। সন্দেহ হলো এরকম খাঁচা দিয়ে কি করেন ডাক্তারবাবু। তাই ভালো করে দেখবার জন্যে খড়খড়িটা একটু ফাঁক করলাম। দেখলাম ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা টেবিল। আর টেবিলের ওপরে—না না সে এক ভয়ানক দৃশ্য। বীভৎস!"—নাটকীয় ভাবে চুপ করলেন সন্তোষবাবু।

"কি, কি, দেখলেন ঠিক করে বলুন?"

"কি করে বলবো আমি বুঝতে পারছি না। টেবিলের ওপর কি যেন একটা পড়েছিল। সাদা। অথচ মনে হচ্ছিল থলথলে। আর, আর সেটা অল্প অল্প করে নড়ছিল। খুব আস্তে আস্তে। ঠিক যেমন করে আমাদের বুক ওঠা নামা করে।"

"ব্যাস, এই—আর কিছু নয়?"

"না না, আরও আছে।" সন্তোষবাবু যেন উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠছেন—"কোন বিশেষ আকৃতি নেই সেটার। কিন্তু তা থেকে

বেরিয়েছিল ঠিক যেন একজোড়া হাত। আঙুলও আছে তাতে। আর সেই বীভৎস হাত দুটো অল্প অল্প করে নড়ছিল।"

উপযুক্ত তদন্তের আশ্বাসে গ্রামবাসীরা বিদায় নিল। পাশ ফিরতেই দেখলাম তরুণ যেন কিছু বলতে চায়। উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছে সে।

"শান্ত হও। শান্ত হও। উত্তেজনার কি আছে এতে?—" বললাম আমি। মনে হলো আমার কথায় সে আশ্বস্ত হলো না।

"আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা খুব সাধারণ। কেউ বোধহয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে তামাসা করেছে। অথবা কোন অচেনা জন্তুকে দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠেছে।"

"কিন্তু সবাই একবাক্যে বলে সে হাত পাগুলো ঠিক মানুষের মতো।"—তরুণ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল।

"হ্যাঁ, তা অবশ্যি সবাই বলল। কিন্তু……?"

তরুণ নানা কারণ দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল যে আমি একটা বিরাট ভুল করছি। শেষকালে বলল—"আমি কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই আনন্দপুর সম্বন্ধে কানাঘুষা শুনেছি।"

"বেশ তো, কি শুনেছো বলই না।"

"না, অবশ্য খুব নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু যা রটে তার মধ্যে কিছু সত্যি আছে নিশ্চয়ই।"—বলল তরুণ।

"বেশ ভাল কথা, তোমার কি মনে হয় বলো।" আমি তাকে বলার জন্য উৎসাহ দিলাম।

বেশ অনেকক্ষণ ভেবে সে ধীর গলায় বলল—'আমার মনে হয় আমরা একটা বিরাট রহস্যের জালে পড়েছি। বৈজ্ঞানিক রিসার্চের আড়ালে ডাক্তার এমন একটা কিছু করেছে যাতে গ্রামের সমস্ত লোক ভয় পেয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি আমি?"

"না, কিছুই তো বুঝলাম না?"

"আমরা মানে আমাদের 'আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো'র মতো এক ডাক্তারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।" বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল তরুণ।

"না, না, তুমি বড় বেশী চিন্তা করো। ওসব কোনকিছু নয়।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হেসে উঠল তরুণ। বলল—"আমি বলতে চাইছি যে আমরা এমন এক ডাক্তারের দেখা পাব যে প্রকৃতিকে মানে না, খোদার উপর খোদকারি করে। জীবজন্তুর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে নিজের খুশি মতো যা খুসি বানায়। জীবজন্তুদের অসীম কষ্ট দিয়ে ভগবান সাজতে চায় সে।"

এতক্ষণে তরুণের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তরুণ যে প্রাণ দিয়েও জীবজন্তুদের কষ্ট লাঘব করতে চায়। সুতরাং তরুণের এদিক দিয়ে চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক। হেসে বললাম আমি, "তুমি কি মনে করো আমরা আনন্দপুর গেলে প্রথমেই অভ্যর্থনা জানাবে দুপায়ে দাঁড়িয়ে এক ঘোড়া-মানুষ। অথবা এক কুকুর-মানুষ দরজা খুলে আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করবে?" আরও বললাম—"নিতান্ত মন্দ কল্পনা করোনি তরুণ। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন আমাদের জগৎ নিতান্তই বাস্তব। অবশ্য অভিযোগ যখন এসেছে তখন তদন্ত আমরা করবোই। কিন্তু আমার বিশ্বাস শেষকালে তুমি নিরাশ হবেই হবে। আরে, সব সময় কল্পনা করলেই কি সব হয়? বাস্তবের কথা চিন্তা করো।"

কিন্তু তরুণকে বোঝানো গেল না। সে গোঁজ হয়ে বসে রইল। কল্পনাই যে তার জীবন। জীবজন্তুর কল্যাণ সাধনই তার জীবনের যেন সব। বেশ বুঝতে পারলাম মনে মনে সে গভীর চিন্তা করে চলেছে।

"কিন্তু হাত—হাত কেন। আঙুল কেন? জন্তুর হাত কি মানুষের মত হত?"—উত্তেজনা তার চোখে মুখে প্রকাশ পেতে থাকে।

"যাক, যখন যাব তখন দেখা যাবে। এখন ওসব ভাবনা ছাড় তো!"—বললাম আমি।

যাই হোক, আমার মনেও কিন্তু অস্বস্তির রেশ জেগে রইল।

পরের দিন। ভোর বেলা। আমি আর তরুণ আনন্দপুরে গেলাম। একটি মাত্র বড় বাড়ী আছে। আনন্দলোক।

আনন্দলোকের সামনে দাঁড়াতেই বেঁটেখাটো একটা লোক বেরিয়ে এল। আমার পরিচয়পত্র দিলাম হাতে। সে আমাদের এক লম্বাচওড়া বৈঠকখানায় নিয়ে বসালো।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো। তরুণ তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। চোখে মুখে তার সন্দেহের আভাস। বেশ ছিমছাম ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা বড় টেবিল ও তার চারপাশে কিছু চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে। তরুণকে বললাম সে যেন সব সময় সজাগ থাকে। সবকিছু যেন ভাল করে দেখে। কেন না আমি হয়তো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সব দেখতে পাব না। অবশ্য তাকে সতর্ক করে দিলাম যেন কোন বিষয়েই সে উত্তেজিত হয়ে না পড়ে। ডাক্তার যেন কোন সন্দেহ না করে তার ব্যবহারে।

সেই লোকটি ঘরে ঢুকলো, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। ডাক্তারবাবু নতুন ঘরে রয়েছেন—সেখানেই আপনাদের নিয়ে যেতে বলেছেন।"

নতুন ঘর। সেখানেই সন্তোষবাবু যেন কিসব দেখেছিলেন?

নতুন ঘরটা বিরাট বড়। কিন্তু একতলা হলেও এই ঘরটা এত উঁচু যে দোতলাকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। শেষের দিকে একটা দরজা খোলা রয়েছে। আমরা সেই দরজা দিয়েই ঢুকলাম ঠিক আমাদের সামনেই ডাক্তার অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেশ লম্বা ঢিলে-ঢালা পোষাক পরা। মুখে বেশ বড় দাড়ি। সৌম্য শান্ত চেহারা। আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

তাইতো। একি! এই জন্যেই কি আমরা দেখা করার অনুমতি পেলাম! "তোমার কথা মনেই হয়নি যে তোমার নামও অনিরুদ্ধ। আর কি করেই বা মনে পড়বে বলো?" রীতিমত অবাক হয়ে বললাম আমি।

"এতে অবাক হবার কি আছে? আমি কিন্তু জানতাম তুমি বদলি হয়ে এই থানায় এসেছো।"

তরুণকে ডেকে বললাম—"তরুণ, এসো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি ডক্টর অনিরুদ্ধ মিত্র। জান তরুণ, ছোটবেলায় এই অনিরুদ্ধই আমাকে প্রাণীবিজ্ঞান শেখাবার অনেক চেষ্টা করতো।"

তরুণ কিন্তু বেশ সন্দেহের চোখে অনিরুদ্ধের আপাদ-মস্তক দেখে নিলে। ও ভাবছিল শত্রুতা করতে এসে এতখানি মাখামাখি করার কি দরকার? হাবভাব দেখে মনে হলো বন্ধুবর আমার ওপরও বিরূপ হয়ে উঠেছে।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এসো।" অনিরুদ্ধ সাদর আমন্ত্রণ জানালো।

পিছু পিছু ঘরের মাঝখানে এলাম। চেয়ার টেবিল দিয়ে সুন্দর করে সাজান। একটা মূল্যবান কোচের উপর আমি ও তরুণ বসলাম।

"কাজের কথায় আসা যাক্। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমাদের আগমনের হেতু,"—বললাম আমি—"সুতরাং কাজের কথা-বার্তা সেরে নিয়ে বরং গল্পগুজব করা ভাল। কি বলো? তরুণ তোমার মত কি?"

অনিরুদ্ধ একবার তির্যক দৃষ্টিতে তরুণের দিকে তাকালো। তরুণের অবস্থা দেখে তার মনে বোধহয় সন্দেহ জেগেছে।

আমরা যা শুনেছি সবই বললাম। শিয়ালমুখো মানুষের কথা শুনে মনে হলো অনিরুদ্ধ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, জানোয়ারগুলোর কোন ক্ষতি হয়েছে নাকি?"

আমাকেই প্রশ্ন করল অনিরুদ্ধ।

"এতক্ষণে বোঝা গেল। আপনারই এই কাজ। কতকগুলো নিরীহ জীবকে আপনিই এইরকম করে কষ্ট দিয়েছেন?"—উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল তরুণ।

অনিরুদ্ধ শুধু অবাক বিস্ময়ে একবার তাকাল তরুণের দিকে। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল—"কি কাজ করেছি আমি? কিন্তু আমি যতদূর জানি তারা তো অসুখী নয়! তাদের দুঃখের কথা আপনি জানলেন কেমন করে?"

তরুণ কিন্তু এর ধার দিয়েও গেল না। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল—"এটাই চাইছিলাম। উনি স্বীকার করেছেন যে…"

"তরুণ তুমি চুপ করবে কি? বেশী উত্তেজিত হয়ো না। আমাকে বুঝতে দাও।" প্রায় ধমক দিয়েই চুপ করালাম ওকে।

কিন্তু তরুণ যেন কিছুই শুনলো না। নিজের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে সে অস্থির হয়ে পড়েছে।

"আপনি হাতগুলো পেলেন কোথা থেকে?" বেশ জোরের সঙ্গে প্রশ্ন করল তরুণ।

"তোমার বন্ধুটি দেখছি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে! কি ব্যাপার বল তো?"—অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল আমাকে।

"তরুণ, খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? আমাকে কিছু বুঝতে দেবে, না, তুমিই সব কিছু করবে? তোমার যা প্রশ্ন করার তা শেষকালে করো। এখন চুপ করো দেখি।" জোর করে থামাবার চেষ্টা করলাম ওকে।

তরুণের হয়ে অনিরুদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম—"ওর ব্যবহারের জন্য সত্যিই দুঃখিত আমি। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ আমাদের অবস্থা। নালিশ এলে তদন্ত করাই আমাদের কাজ। সমস্ত গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানি তুমি আমাদের কাছে সব খুলে বলবে। আর তরুণ"—আমি তরুণের

দিকে ঘুরে বললাম,—"তুমি তোমার প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। কিন্তু মনে রেখো ইনি আমার বন্ধু অনিরুদ্ধ, ডক্টর মোরো নয়।"

কিন্তু তরুণ যেন কোন কিছুই মানবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

"আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি বলতে চাইছি। অনিরুদ্ধ বাবু প্রকৃতির বিরুদ্ধচারণ করছেন কেন? আমি জানতে চাই কোন্ অধিকারে সাধারণ জীবজন্তুদের উনি কিম্ভূত আকৃতি দিচ্ছেন?"

ডাক্তার অনিরুদ্ধ ভরাট গলায় আস্তে আস্তে বললেন—"আগে আমার সব বক্তব্য না শুনলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না তরুণবাবু। কি করে আপনি ধরে নিলেন যে আমি প্রকৃতির ওপরে চালাকি করছি? নতুন করে কোন জীব বা জীবনের সৃষ্টি করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

"কিন্তু আপনার অদ্ভুত ইচ্ছার জন্যে সবাই ভয় পেয়ে গেছে আর তাই নয়…।"

তরুণের কথায় কর্ণপাত না করেই অনিরুদ্ধ বলে যেতে লাগল—"আপনারা আমাকে আগাগোড়া ভুল বুঝেছেন। আপনারা বলতে চাইছেন যে আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণার আড়ালে জীব জগতের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাইছি। আপনি শুধু সাধারণ গবেষণাই করছেন না। ভয়ানক রকমের ব্যবচ্ছেদ করে কয়েকটি নিরীহ জীবকে কিম্ভূতাকার দিয়েছেন। আর তারা গ্রামের লোকেদের হাতে কষ্ট পাচ্ছে।"—এতক্ষণে মনে হলো তরুণ যেন সব কথা বলতে পারল,—"অবশ্য আপনার গবেষণা করার অধিকার আছে। কিন্তু এখানে এমন কতকগুলো অপ্রাকৃতিক ব্যাপার ঘটছে যার ফলে আমাদের আর চুপচাপ-বসে থাকা যায় না।"

অনিরুদ্ধ মাথা নেড়ে বলল—"ঠিক ঠিক। আগে আমার তাই মনে হয়েছিলো। আমি ঠিক করেছি আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি গবেষণার ফল সর্বসমক্ষে প্রকাশ করবো! কিন্তু আমি অন্ততঃ

দুই কি তিন মাস শান্তিতে থাকতে চাই। ইতিমধ্যে আমার গবেষণার পুরো ফল পাব। নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারছেন না? সব খুলে বলছি—আশা করি এতে আপনাদের বোঝার সুবিধে হবে।"

বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে তরুণের দিকে চেয়ে রইল। তরুণের মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই। তারপর অনিরুদ্ধ নিজেই বলতে আরম্ভ করল—

"আসল কথা হল, আপনারা যা সন্দেহ করছেন আমি তা করিনি বা একের সঙ্গে অন্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়াও দিই নি। আমিই তাদের সৃষ্টিকর্তা।"

কয়েক মুহূর্ত বোধহয় হবে আমি কিছুই যেন বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তরুণ আবার মুখ খুলল—

"হ্যাঁ সবাই এরকম বলে। কিন্তু কোনকিছু তৈরী করার তো একটা পটভূমিকা দরকার। আপনি নিশ্চয়ই কোন জীবন্ত প্রাণী দিয়ে আরম্ভ করেছেন আর তারই ওপর ব্যবচ্ছেদ করে এক বীভৎস ভয়ানক জীবে পরিণত করেছেন।"

"না, না" অনিরুদ্ধ বলল—"আমি তা বলিনি, বলব না। আমি বলছি, আমিই ওদের তৈরী করেছি। একদম গোড়া থেকেই তারা আমারই সৃষ্টি। একটা নিষ্প্রাণ বস্তুকে আমি প্রাণ দিয়েছি। আর এই প্রাণ বা জীবন আমারই সৃষ্টি। ধার করা জীবন নয়।"

বলে কি অনিরুদ্ধ? মানুষ কি প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে? বললাম—"মানে, তুমি কি সত্যি জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছ বলে দাবী কর নাকি?"

—"আরে সেটা তো তুমিও পার আমিও পারি, সবাই পারে। জৈবিক নিয়মে তা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হল এই যে আমি এক জীবনী শক্তিকে আবিস্কার করেছি। এই 'জীবনী শক্তি' ইনজেকসান করেই আমি ওদের জীবন্ত করে তুলেছি।"

অবাক বিস্ময়ে আমরা চেয়ে রইলাম। এ বলে কি? একি পাগলের প্রলাপ উক্তি!

বহুক্ষণ পরে তরুণ কথা বলল—বেশ জোরেই—"আমি এসব বিশ্বাস করি না। আপনি একজন সামান্য ডাক্তার হয়ে জীবনী শক্তিকে আবিষ্কার করে ফেললেন? ভয়ের চোটে আবোল তাবোল বকছেন দেখছি।"

অনিরুদ্ধ কিন্তু মৃদু হেসেই বলল—

"আবার বলছি, আমি এক জীবনী শক্তিকে আবিষ্কার করেছি। বুঝতে পারছি আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কেন? কেউ না কেউ একদিন জীবনী শক্তিকে আবিষ্কার করবেই। আর সেটাই যদি আমার দ্বারা সম্ভবপর হয় তো অবাক হবার কি আছে?"

তরুণ কিন্তু নিজের গোঁ নিয়ে রইল।

বলল—"আমি বিশ্বাস করি না, করি না, করি না। কোন প্রমাণ দিতে পারেন আপনি?"

"নিশ্চয়ই," অনিরুদ্ধ বলল—"আর প্রমাণ না দিলে কেই বা বিশ্বাস করবে! প্রথম অবস্থায় হয়তো আপনাদের ঘেন্নাই করবে। কিন্তু তাছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই। অবশ্য তোমার বন্ধু হাত সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তিত। ওঁর বিশ্বাস হাতটা সত্যিই মানুষের, অবশ্য যদি কোন সহৃদয় ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে হাত দুটো উইল করে দিয়ে যায় তবে সে হাত নিয়ে কাজ করতে মোটেই দ্বিধা করব না আমি। তাতে আমার কাজের অনেক সুবিধে হবে। কিন্তু চাইলেই তো সব পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন বিদ্যা আর বুদ্ধির শরণাপন্ন হতে হয়েছে। অবশ্য কাছ থেকে দেখলে মানুষের হাতের সঙ্গে অনেক তফাৎ ধরা পড়বে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এমন একদিন আসবে যেদিন নিখুঁত মানুষের মতো হাত তৈরী করতে পারব।

"তরুণবাবু, আমার তৈরী জীব দুটি সম্বন্ধে আপনার ধারণা সত্যি অমূলক। ওদের তৈরী করতে আমার প্রচুর সময় আর অর্থ-ব্যয় হয়েছে। সুতরাং তাদের হাবভাব, স্বভাব না জেনে অবলা-জীবের প্রতি কষ্ট দিচ্ছি বলে আপনার অভিযোগের কোন মানে হয় কি?"

"আমি এখনও আপনার কথা বিশ্বাস করছি না।" তরুণ বলল।

বেশ বুঝতে পারলাম তরুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সত্যিই তার অভিযোগ ভিত্তিহীন নয় তো?

"তা হলে প্রমাণ দিতে হবে, কেমন?" অনিরুদ্ধ বলল—"বেশ, আসুন আমার সঙ্গে।"

* * * *

সন্তোষবাবু যা দেখেছিলেন তা খুবই সামান্য। অনেক কিছুই তিনি দেখতে পান নি। অনেক কিছুর মধ্যে সেই ঘরে ছিল একটা অদ্ভুত গন্ধ। বেশ অস্বস্তিকর সেই গন্ধ।

ডাঃ অনিরুদ্ধ অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল—"গন্ধটা সম্বন্ধে তোমাদের আগেই বলা উচিত ছিল আমার।"

"না, না, আমাদেরই সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল"—কাশতে কাশতে বললাম আমি।

ঘরটা সত্যি খুব বড়। প্রায় ১০০ ফুট লম্বা আর উচ্চতা বোধ হয় ৩০ ফুট। প্রচুর ছোট বড় যন্ত্রপাতিতে প্রায় ভর্তি। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিও প্রচুর। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম। অবশ্য দুভাগে সাজান আছে যন্ত্রগুলো। একদিকে আছে রসায়ন বিদ্যার যন্ত্রপাতি আর অপরদিকে টুল, বেঞ্চি, লেদ-মেশিন ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি একদম শেষে থরে থরে সাজান আছে। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য নানা আকারের মিটার শোভা পাচ্ছে। ঘরের একধারে একটা অপারেশন টেবিল ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি রয়েছে।

তরুণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। ঘরের আর একদিকে বড় বৈদ্যুতিক চুল্লীও রয়েছে।

"সাইক্লোট্রন, ইলেকট্রোনিক মাইক্রোস্কোপই শুধু নেই দেখছি।" রহস্য করেই বললাম আমি।

"আরও কিছু বল না? আরে, তোমার বন্ধু কি দেখছে বলতো?"

তরুণ ততক্ষণে অপারেশন টেবিলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, টেবিলের ওপর নীচ কোন জায়গায় বাকী রাখলো না সে—যদি কোন রক্তের ছিটে ফোঁটা নজরে আসে। আমরা আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"তরুণবাবু, এদিকে দেখুন। আপনার কল্পনার উৎস বোধ হয় এটাই—" অনিরুদ্ধ বলল।

ড্রয়ার খুলে একটা হাত বের করে টেবিলের ওপর রাখল অনিরুদ্ধ।

"দেখুন অরুণবাবু ভালো করে দেখুন।"

কি রকম একটা হলদেটে রং হাতটার। প্রায়ই মোমের মতন দেখতে। গোটা হাত নয়। ঠিক কাঁধ আর কনুয়ের মাঝখান থেকে কাটা, তবে দেখতে ঠিক মানুষের হাতের মত। কিন্তু কাছে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম—না, মানুষের হাতের মত নয়। মসৃণ, কোন চিহ্ন নেই লোমকূপের। আর হাতের আঙুলে কোন নখের চিহ্ন নেই।

"এখন একে ওরকম করে দেখার কিছু নেই"—আমাদের অবস্থা দেখে অনিরুদ্ধ বলে উঠল।

হাতের কাটা অংশ থেকে একটা লোহার নল বেরিয়ে আছে। সেটাকে দেখিয়ে তরুণ জিজ্ঞাসা করল—"এটা আবার কি?"

"স্টেনলেস্ ষ্টীল", অনিরুদ্ধ বলল, "সবচেয়ে সোজা আর অল্প খরচে এই দিয়েই কেমন হাড়ের কাজ হয়। অবশ্য পরে আমি এর

বদলে প্লাস্টিকের হাত ব্যবহার করবো। আর প্লাস্টিক ওজনেও হাল্কা।"

তরুণের চোখে মুখে যেন হতাশার ছায়া ঘনিয়ে এল। এটা তো সত্যি কোন জীবন্ত প্রাণীর অংশ নয়।

"কিন্তু শুধু হাত কেন? আর সব কোথায়?" নিজের জেদ বজায় রাখতেই যেন জিজ্ঞাসা করল সে।

"কোন জীবন্ত প্রাণীর কাছে হাতের মতো প্রয়োজনীয় আর কিছুই নেই। আর, 'আর সব'-এর কথা যে বলছেন সেটার সম্বন্ধে বলছি মূল বস্তু যখন আবিষ্কার করতে পেরেছি তখন প্রমাণ করার জন্য আমি এক সম্পূর্ণ জীব তৈরী করেছি। শিয়াল-মানুষ অবশ্য এর প্রথম ধাপ। বেঁচে থাকার মতো তাদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। কিন্তু গঠনমূলক কোন কিছুই ওরা চিন্তা করতে পারবে না। অবশ্য তার দরকারও নেই ওদের।"

"তোমার স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবটি তাহলে গঠনমূলক চিন্তা করতে পারে বলো?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাদের মাথায় যতটুকু মস্তিষ্ক আছে তারও ঠিক ততটুকু আছে। তবে আমাদের চেয়ে ওর মাথাটা একটু বড়। অবশ্য তার অভিজ্ঞতা দরকার—দরকার শিক্ষার। কিন্তু মোটা মগজ থাকার জন্য সবকিছুই শিশুদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি সে শিখতে পারবে।"

"কোথায় সে?" উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার বলল—"সবাই দেখছি একেবারে প্রথমেই তৈরী জিনিষ দেখতে চায়। বেশ ভাল কথা। কিন্তু তার আগে মনে হয় আরও কিছু প্রমাণ দেওয়া ভাল। কারণ তোমার বন্ধুর চোখে মুখে এখনও দেখছি অবিশ্বাসের ছাপ।"

এরপর অনিরুদ্ধ সার্জিকাল যন্ত্রপাতির আলমারিটা খুলে ফেলল। ভেতর থেকে আকারবিহীন সাদা এক তালপাকানো বস্তুকে হাতে

করে টেবিলের ওপর রাখলো। পাশের একটা সুইচ টিপে দিল। ঐ বস্তুটিকে নিয়ে টেবিলের ঐ অংশটি ঘুরতে আরম্ভ করল।

নিজের চোখে বোধ হয় ভুল দেখছি মনে হল। তালপাকানো বস্তাটা থেকে ঠিক হাতের মতো কি একটা বেরিয়ে আসছে না?

"সর্বনাশ! এ যে ঠিক হাতের মতো।" মুখ থেকে অজান্তে বেরিয়ে এল কথা কটা।

"হ্যাঁ ঠিক হাতের মতো। আর এই জিনিষটাই আমার এত-দিনের সাধনার ফল। এ দিয়ে সবকিছুই হয়। একটা দেহ তৈরী করতে যা যা দরকার, সবই এ থেকে পাওয়া যায়। যেমন, খাদ্যনালী, রক্তবাহীশিরা, উপশিরা, স্নায়ুমণ্ডলী, শ্বাসযন্ত্র ইত্যাদি। আসল কথা এই বস্তুটা জীবন্তভাবে বাঁচতে পারে।"

এরপর অনিরুদ্ধ পাশের সুইচবোর্ড থেকে কয়েকটি তার এনে জিনিসটার সঙ্গে লাগিয়ে দিল।

"তরুণবাবু, ভাল করে দেখুন এর মধ্যে কোন প্রাণের স্পর্শ নেই।"

তরুণ ভাল করে বস্তুটাকে পরীক্ষা করল। আঙুল দিয়েও স্পর্শ করল। না, ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এল সে।

"তাহলে ইলেক্ট্রিক আসল জিনিষ বলো"—প্রশ্ন করলাম আমি।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অনিরুদ্ধ বোতল থেকে ফিকে নীল রংয়ের তরল পদার্থ একটি বিকারে ঢেলে নিল।

"হতে পারে ইলেকট্রিক। আবার কেমিক্যালও হতে পারে। তুমি কি মনে করো আমার গোপন কথা সব তোমাকে বলব নাকি?" অনিরুদ্ধ হেসে বলল।

তারপর তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল—"কি দেখলেন? জীবজন্তু নয় নিশ্চয়ই?"

তরুণের বলার কিছুই নেই। চুপ করে রইল সে।

বেশ কিছু ইলেকট্রোড লাগান হলো ওটার গায়ে। তারপরে ভাল করে ঐ বস্তুটার ওপর তিনটে জায়গা বেছে নিয়ে অনিরুদ্ধ সিরিঞ্জে করে ফিকে নীল আরক ইনজেকসান করল। তারপর জিনিসটার সারা গায়ে দুবার বেশ ভাল করে ছড়িয়ে দিল ঐ আরকটা। শেষকালে চার পাঁচটা সুইচ একসঙ্গে টিপে দিল।

মৃদু হেসে এবার অনিরুদ্ধ বলল—"পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।"

কিন্তু তিন মিনিটও গেল না। ঐ বস্তুটা মৃদু কাঁপতে আরম্ভ করল। আস্তে আস্তে কাঁপুনি বাড়তে লাগল। বেশ একটা ছন্দ আছে এই কাঁপুনির। তারপর টেবিলের ওপর গড়াতে আরম্ভ করল। হাত দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। স্পষ্ট দেখলাম হাতের আঙুলগুলো বেশ টান টান হয়েছে। তারপর টেবিলের ওপরটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল সেই আঙুলগুলো। উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার।

গলার ভেতরটা মনে হল শুকিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। নিজের চোখে কি ভুল দেখছি? একি সম্ভব? স্বপ্ন! না দেখলে কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে এল। হঠাৎ মনে হল বিরাট এক সম্ভাবনার কথা। আনন্দে লাফিয়ে উঠে অনিরুদ্ধের হাত চেপে ধরলাম। "তাহলে, মৃতদেহে ইনজেক্সান করলে তো···!"

কিন্তু, না। অনিরুদ্ধ মাথা নাড়ল। "না, কোন কাজই হয় না সেখানে। আমি চেষ্টা করে দেখেছি। এটাকে আমি 'জীবনীশক্তি' বলেছি বটে তবে প্রকৃতিদত্ত জীবনীশক্তি থেকে এর অনেক পার্থক্য। কিন্তু এর কোন মানেই আমি বুঝতে পারি না।"

তফাৎ যাই থাক না কেন এর মধ্যে এক বিরাট সম্ভাবনা আছে। মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা পাল্টে যাবে। বিরাট এক বিপ্লবের সূত্রপাত যেন দেখতে পেলাম। অকল্পনীয় সেই সম্ভাবনা।

কিন্তু তরুণ যেন ম্যাজিক দেখছে। সারাক্ষণই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে ওদিকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে তরুণ আঙুল দিয়ে বস্তুটা ছুঁলো! তারপরেই 'বাপ রে' বলে ছিটকে এল—যেন হাজার ভোল্টের শক লাগল তার হাতে।

* * * *

এতক্ষণে বোধহয় তরুণের ভুল ভেঙে গেছে। বললে "এবার আপনার সম্পূর্ণ জীবটিকে দেখান তো ডাক্তারবাবু।"

এখনও সন্দেহ? আসল জিনিষটা না দেখে যেন স্বস্তি নেই তরুণের।

"ভাল কথা" অনিরুদ্ধ বলল—"আগেই বলে রাখি ওকে আমি শ্রীমতী বলে ডাকি। কোন বিশেষ নামই মনে হয় ওকে মানায় না। কিন্তু নাম যাই হোক সে আমারই তৈরী মানুষ!—জীবন্ত মানুষ।"

অনিরুদ্ধর পেছন পেছন গেলাম আমরা। পাশের ঘরে বিরাট এক খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মোটা লোহার রড্ দিয়ে তৈরী। অনিরুদ্ধ খাঁচার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

খাঁচার ভেতর কি বস্তু যে আছে তা অনুমান করতে পারিনি। তরুণের অবস্থাও তথৈবচ। গভীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমাদের বোধ হয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছল। কোন বর্ণনাই বোধ হয় ওর উপযুক্ত নয়। কি বলবো অনিরুদ্ধের 'পরিপূর্ণ' জীবটিকে দেখে? ভয়ানক, বীভৎস, অকল্পনীয়, অস্বাভাবিক···। তবে যতদুর পারি তার রূপ বর্ণনা করছি। জানি না কতদুর প্রকাশ করতে পারবো তার প্রকৃত রূপ।

কালো, ত্রিকোণাকৃতি চকচকে পদার্থ দিয়ে তৈরী দেহ। ওপরের দিকে গম্বুজাকৃতি মাথা। মাটি থেকে প্রায় ৬ ফুট উঁচু। পেটের কাছটা বোধ হয় ৪ ফুট থেকে ৬ ফুট মোটা। আর এই সমস্ত দেহটা দাঁড়িয়ে আছে তিনটি ছোট ছোট গোলাকৃতি পাথরের ওপর। চারটে হাত

বেরিয়ে আছে দেহ থেকে। ঠিক মানুষের হাতের মতো। মাথা থেকে ৬ ইঞ্চি নীচে চোখ দুটো। চোখের পাতাটা শক্ত কিছু দিয়ে তৈরী। বড় বড় গোল গোল চোখ। ড্যাব ড্যাব করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। স্বপ্নেও বোধ হয় কেউ এমন বীভৎসতা দেখেনি। কল্পনা করতেও আমার এখন ভয় হয়।

অনিরুদ্ধ কিন্তু গর্বের সঙ্গে 'শ্রীমতী'র দিকে চেয়ে রইল।

"শ্রীমতী, এরা তোমাকে দেখতে এসেছেন।"

সস্নেহে বললে অনিরুদ্ধ।

বেশ দেখতে পেলাম শ্রীমতী আমার দিকে তাকাল। তারপর একদৃষ্টে তরুণের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের পাতা বন্ধ করার সময়ে 'ক্লিক' করে একটা ধাতব আওয়াজ হল। শ্রীমতীর গলা দিয়ে গুরুগম্ভীর স্বর বেরিয়ে এল।

"এতদিন পরে! কতদিন ধরে আপনাকে বলছি!"

"আরে মোলো যা," তরুণ বলল—"এ যে দেখছি কথা বলতে পারে।"

ড্যাব ড্যাবে চোখ দুটো তরুণকেই দেখছে। ধাতব গলায় বলল—"একজন হলেই আমার হবে। ওর কাঁচের মতো চোখগুলো আমার খুব ভাল লাগছে।"

"শান্ত হও শ্রীমতী, তুমি যা ভাবছ এরা তা নয়। ভবিষ্যতে এ ধরণের কথা আর বলো না," অনিরুদ্ধ তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল—"শ্রীমতীর কোন অভিজ্ঞতাই নেই, কিন্তু ও পুরুষ মহিলার পার্থক্য বোঝে। আর নিজের সম্বন্ধেও অহংকার আছে। অল্পতেই রেগে ওঠা ওর স্বভাব। সুতরাং এমন কিছু করবেন না যাতে ও রেগে ওঠে। ওর চেহারা দেখে অবাক হচ্ছেন তো? খুলে বলছি শুনুন।"

এবার ডাক্তার বক্তৃতার সুরে বলতে আরম্ভ করল—"আবিষ্কারের পরে আমার কর্তব্য হল একটি দুপেয়ে জীব সৃষ্টি করা। পরে অনুকরণ করাই শ্রেয় মনে করলাম। আমার মনে হল মানুষের মধ্যে

অনেক অঙ্গ বেশ দুর্বল। আর কয়েকটা অঙ্গ বেশী হলে খুব ভালো হয়। অবশ্য যান্ত্রিক কারণে কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে।"

তরুণ ভালভাবে জীবটিকে দেখছে। শ্রীমতীও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অবশেষে তরুণ মুখ খুলল—

"এতবড় একটা জীবকে এত ছোট খাঁচায় রাখা মোটেই উচিত হয়নি আপনার।"

ক্লিক!

"আমার বেশ পছন্দ হয় ওকে। খুব ভালো কথা বলে ও। এতেই আমার হবে।" শ্রীমতী বলে উঠল।

তরুণ একটু বিচলিত হল। বহুকাল থেকেই সে জীবজন্তুদের ভালবেসে এসেছে। কথা বলে এই প্রথম এই জীবটাই ওকে সমর্থন করল!

অনিরুদ্ধ কোন কথায় কর্ণপাত না করেই বলতে আরম্ভ করল—"প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন শ্রীমতীর আলাদা মাথা বলে কিছুই নেই। সাধারণ মাথাটি সবটাই প্রায় বাইরে বেরিয়ে আছে আর দেখতেও বিদকুটে। চোখ দুটো বাইরের দিকে অনেকটা বার করা আছে। দেখার অনেক সুবিধা হয় এতে।

"মাথা যেহেতু ঘোরাতে পারে না সেইজন্য আরও কিছু যোগ করতে হয়েছে। আমি শ্রীমতীকে এর জন্য তিনটি চোখ দিয়েছি। দুটো তো আপনারা সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। আর একটি চোখ আছে ঠিক পেছনে। সুতরাং শ্রীমতীর পেছন দিক বলে কিছু নেই। এর ফলে শ্রীমতী যে কোন দিকে যখন খুশী তাকাতে পারে। মাথা ঘোরানোর কোন দরকার হয় না। ওর মাথাটি শক প্রুফ। তাই মাথার প্রধান কয়েকটি অংশ শ্রীমতীর পেটের ভেতরে রাখতে হয়েছে। পাকস্থলী আছে অনেক ওপরে।"

"সবই তো বুঝলাম, শ্রীমতী খায় কিরকম করে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"শ্রীমতীর খাদ্যগ্রহণের ব্যবস্থা আছে পিছনদিকে। চারটে হাতের প্রয়োজন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনারা চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় মানুষের হাতই প্রধান যন্ত্র। যদি অবশ্য সেটা সত্যি হাতের মত হয়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন শ্রীমতীর ওপরের দুটি হাত বেশ সরু আর অনেক যত্ন নিয়ে তৈরী করতে হয়েছে। কিন্তু নিচের দুটি হাত বেশ মোটা আর ভারী কর্মক্ষম।

"শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এবার কিছু জানতে চাইবেন। এখানে আমি প্রবাহমানতা (flow) সূত্রের আশ্রয় নিয়েছি। শ্রীমতী নিঃশ্বাস নেয় এখান দিয়ে আর শ্বাসত্যাগ করে ঐখান দিয়ে। অবশ্য পরের বারে এই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে।

"এমনিতে মনে হতে পারে শ্রীমতীর দেহটা ভীষণ মোটা আর ভারী, ওজন প্রায় ১ টন। আর এত ভারীকে ধরে রাখার জন্য আমার পূর্বের পরিকল্পনা একটু পাল্টাতে হয়েছে। সেইজন্য পা আর পায়ের পাতা হাতীর পায়ের অনুকরণে করতে হয়েছে। কিন্তু পরের বারে এই ব্যবস্থারও সংশোধন করতে হবে।

"তিনটি পায়ের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। মানুষের দু পায়ের উপরে ভর রাখার জন্য অনেক মাংসপেশীর প্রয়োজন আছে। এখানে অত মাংসপেশী যোগ করা সম্ভব হয়নি। তাই শ্রীমতীকে তিনটি পায়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। অসমতল জমিতে দু পায়ের চেয়ে তিন পায়ের সুবিধে অনেক বেশী।

"প্রজনন ব্যাপারে আমি বলতে পারি........."

"আমি বুঝতে পারছি না প্লাষ্টিক আর স্টেনলেস স্টীলের মধ্যে কি করে প্রজনন সম্ভব হবে"—আমি না বলে থাকতে পারলাম না।

"কেন সম্ভব নয় ? প্রজননের প্রয়োজনীয় সমস্ত গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি ওর মধ্যে আছে। পরের বারে এ সমস্তেরই আরও উন্নতি করতে

হবে। এরজন্য আমাকে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। যাই হোক শ্রীমতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার জন্য একজন শ্রীমান তৈরী করে দেবো।" মুচকি হাসল অনিরুদ্ধ।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই হবে" ধাতব কণ্ঠ আবার বাধা দিল অনিরুদ্ধকে। শ্রীমতী আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তরুণের দিকে।

অনিরুদ্ধ কিন্তু বলে চলল—"অবশ্য শ্রীমতী নিজের চেহারা কেমন তা জানে না। সে হয়ত মনে করে………"

"আমার প্রয়োজন আমি যথেষ্ট বুঝি"—গম্ভীর গলায় শ্রীমতী বলল—"আমি………"

ডাক্তার বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠল—"হবে হবে, আমি যখন বলছি সব হবে।'

"না না আমার·ওকে চাই"—শ্রীমতী ক্রমশঃ অস্থির হয়ে ওঠে।

"শান্ত হও শ্রীমতী, নইলে—" ধমকে উঠল অনিরুদ্ধ

বিদকুটে অঙ্গভঙ্গি করে উঠল শ্রীমতী।

তরুণ এবার বেশ জোরে বলে উঠল—"এ কিছুতেই মানতে পারি না। স্বীকার করি শ্রীমতী আপনার সৃষ্টি। কিন্তু এভাবে ওকে রাখা মোটেই উচিত নয়। আপনি শ্রীমতীকে মানুষ করতে গিয়ে এক বিকট দৈত্যে পরিণত করছেন।

"যাই হোক, শ্রীমতীকে এখন দুঃষ্প্রাপ্য জীব বলা যায়। আর সেইজন্য তাকে এত ছোট খাঁচায় কষ্ট দিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আর ওর কথা থেকেই বোঝা যায় যে ওর চাহিদা আছে। কেন ওর চাহিদা মেটাচ্ছেন না, অনিরুদ্ধবাবু?"

"তরুণ, ভুলে যেও না ও তোমাকে চায়।"—আমি সাবধান করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী বলে উঠল—

"কি সুন্দর! কি সুন্দর ওর চোখ! ওকে আমার চাই-ই-চাই!" শ্রীমতী এবার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। আর শ্রীমতীর দীর্ঘ-

নিঃশ্বাসে মনে হল তরুণ বিচলিত হল।

"এতেও যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় ও অসুখী তবে…" বলতে বলতে খাঁচার অনেক কাছে এগিয়ে গেল তরুণ।

"কি করছেন কি?" বলেই ডাক্তার ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণকে ধরে ফেলল। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে শ্রীমতী শিকের ফাঁক দিয়ে একটা হাত বের করে তরুণকে ধরবার চেষ্টা করছে।

"কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন বলুন তো?"

মুখ দেখে মনে হল তরুণ বেশ ভয় পেয়ে গেছে।

"মানে…," কি যেন তরুণ বলতে গেল। কিন্তু তার কথা ডুবে গেলে শ্রীমতীর গলার আওয়াজে। ভয় দেখানো কণ্ঠে শ্রীমতী বলল—"ওকে আমার কাছে আসতে দাও। ওকে আমি চাই।"

চারটে হাত দিয়ে শ্রীমতী সামনের লোহার রড জোর করে ধরে রয়েছে। দুটো শিক হাতের চাপে ভেঙে গেল। মোটা রডটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে শ্রীমতী। ড্যাব ড্যাবে দুচোখ দিয়ে যেন লেহন করছে তরুণকে। রাগে গরগর করে উঠল শ্রীমতী।

"ওকি! ওকি!…" আর কিছু শোনা গেল না।

"জিমি! জিমি!" বিকট আর্তনাদে ঘর ভরে উঠল। তিনটে পা মাটির উপরে সজোরে ঠুকছে। আর তার ফলে সমস্ত বাড়ী কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ডাক্তারের মুখ ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে।

"বুঝতে পারছি না। হরমোন ইনজেকসান কি খুব বেশী হয়ে গেছে?" অজান্তে প্রশ্ন করল নিজেকে।

তরুণ এতক্ষণে সচেতন হয়েছে। কয়েক পা পিছনে এল সে। কিন্তু তাতেও শ্রীমতীর উত্তেজনা কমলো না।

বিকট আওয়াজ করে চেঁচিয়ে উঠল শ্রীমতী—"জিমি জিমি জিমি!" বুক ফাটা আর্তনাদ, সারা ঘর গম গম করতে লাগল।

সেই ধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

"আমার মনে হয়, ওর সামনে থেকে আমাদের সরে যাওয়া দরকার।" বললাম আমি।

ডাক্তার আমার কথায় সম্মতি দিল। তরুণ বলল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল সেই ভাল।"

আমরা তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। পেছনে শ্রীমতীর গলার আওয়াজ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। খাঁচাটা ঝনঝন করে উঠল। পা ঠোকার দুম দুম আওয়াজ শোনা গেল।

"তরুণ তরুণ, যেও না তরুণ। তোমাকে আমার চাই।" কাতর স্বরে আকাশ বাতাস চিরে গেল।

তরুণ পেছনে চেয়েই দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। শ্রীমতী সজোরে বারংবার ধাক্কা মারতে লাগল খাঁচার গায়ে। অবস্থা বিশেষ সুবিধা-জনক মনে হল না। ডাক্তার দরজা বন্ধ করে দিল।

দড়াম! বিকট আওয়াজ হল ঘরের মধ্যে। দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে গেল। খাঁচার শিকগুলো চারপাশে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে। আর শ্রীমতী বিকট চেহারা নিয়ে দরজার দিকে ছুটে আসছে।

"সর্বনাশ হয়ে গেল" বলল অনিরুদ্ধ।

তরুণের চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। অল্প অল্প ঘাম চিক চিক করছে কপালে।

"আমরা চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে..." তরুণ বলল।

"না তা হয় না। বাইরের দিকে জানালা দিয়ে ও আপনাকে দেখতে পাবেই।"

"তা হলে"—তরুণের স্বরে এবার আতংক।

ডাক্তারের পিছু পিছু আমরা বসবার ঘরে চলে এলাম। ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশের কাছে ফোন করে তাড়াতাড়ি সাহায্য চাইল অনিরুদ্ধ। ফোন রেখে বলল—"ওরা না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই

করতে পারি না। ল্যাবরেটারী ঘরটা খুব শক্ত। মনে হয় ভাঙতে পারবে না। তবে ওর শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠছে আমাদের। ডাক্তার আরও বলল "সৌভাগ্যের কথা শ্রীমতী এ বাড়ীর দরজা জানলা সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ল্যাবরেটারীর সব কিছু বোধহয় গুঁড়িয়ে ফেলছে। শুনুন আওয়াজ শুনুন।" দূর থেকে মড়্‌মড়্ আওয়াজ আসছে। কাঁচ ভাঙার শব্দও শোনা গেল। মাঝে মাঝে অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে আসছে। আর থেকে থেকে "তরুণ, তরুণ" চীৎকার শোনা গেল।

অনিরুদ্ধের চোখে মুখে ক্রমশঃ হতাশার ভাব ফুটে উঠছে। অসহায় অবস্থায় পায়চারী করতে আরম্ভ করল সে।

"সমস্ত নষ্ট হয়ে গেল। কত দামী ফরমুলা। সারাজীবনের সাধনা নষ্ট হয়ে গেল। আর এর জন্য গ্রামবাসীদের হয়ত প্রচুর ক্ষতি হবে। কিন্তু আমার যা গেল তা আর ফিরে পাব না। তরুণ বাবু তাকে উত্তেজিত না করলে সে কখনই উত্তেজিত হত না। আগে কোনদিনও এরকম হয়নি।"

তরুণ বোধহয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু একটা কানফাটা আওয়াজ সব কিছু ডুবে গেল। কোন কিছু ভাঙার শব্দ। আর তার পরেই শোনা গেল—"জিমি। তরুণ, তরুণ আমার।"

তরুণ চেয়ার ছেড়ে উঠেই আবার বসে পড়ল। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

"পেয়েছি পেয়েছি" অনিরুদ্ধ হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল, "নিশ্চয় আমি শ্রীমতীর শরীরের ওজন অনুযায়ী হরমোন দিয়ে ফেলেছি। কি মারাত্মক ভুল! হাড়ের ওজন যে বাদ যাবে। ছিঃ ছিঃ। এ আমি কি করলাম, ইস!"

একটা বিকট আওয়াজে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

শ্রীমতী দরজা ভেঙে ফেলেছে। পাগলা হাতীর মত ধেয়ে

আসছে এদিকেই। যেখান দিয়ে শ্রীমতী আসছে সেখানকার সব কিছু ভেঙে পড়ছে দেহের ভারে। পা ফেলার বিকট আওয়াজ উঠছে প্রতি মুহূর্তেই।

অনিরুদ্ধ আর দেরী করল না। "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি সামনেই সিঁড়ি আছে।"

সেই মুহূর্তেই শ্রীমতী আমাদের দেখতে পেল। বিকট চিৎকার করে উঠল সে। আমরা সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলাম। দ্রুতগতি একমাত্র আমাদের সম্বল। শ্রীমতী কিন্তু তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না দেখলাম। আমি আর ডাক্তার একসঙ্গে ওপরে উঠে এলাম। আমার মনে হল তরুণ ঠিক আমার পেছনেই আছে। সঠিক কিছু বলতে পারবো না। হয়তঃ তরুণ সিঁড়ির ওপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অথবা ভয়ে কাঁপছিল। কিন্তু আমরা যখন দেখলাম তখন তরুণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। আর তার পেছনে ধেয়ে আসছে মূর্তিমান যমদূতের মত শ্রীমতী।

তরুণ ওপরে উঠে আসছে। আর শ্রীমতীও ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু সিঁড়ির ধাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকায় শ্রীমতীর বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু কোন বাধাই শ্রীমতীর কাছে বাধা নয়। পাঁচটা কি ছয়টা সিঁড়ি উঠেছে এমন সময় পায়ের চাপে মর-মর করে সিঁড়ি ভেঙে পড়ল। শ্রীমতী ইট, বালি পাথরের সঙ্গে নীচে পড়ে গেল। আর তরুণও টাল সামলাতে না পেরে চীৎকার করে প্রায় শ্রীমতীর গায়ের ওপরই আছড়ে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী চার হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তরুণকে।

"কি অপূর্ব বিচারবুদ্ধি!" বিড় বিড় করে বলল অনিরুদ্ধ।

"বাঁচাও, বাঁচাও,"—তরুণের গলা দিয়ে শুধু এই শব্দই শোনা গেল।

"আঃ" শ্রীমতী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হারান প্রিয়কে যেন ফিরে পেয়েছে শ্রীমতী।

তরুণকে জড়িয়ে ধরে শ্রীমতী কয়েক পা এগিয়ে গেল।

"অধীর হয়ো না।" ডাক্তার বলল তরুণকে, "এমন কিছু করো না যাতে শ্রীমতী ক্ষেপে ওঠে।"

তরুণকে তিন হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে শ্রীমতী আর এক হাত দিয়ে আদর করছে।

আমরা ত্ব'জনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি বললাম—"একটা কিছু আমাদের করতে হয়। শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই হবে না।"

"কোন স্ত্রীলোককে এই সময়ে বাধা দেওয়া কি উচিত হবে? হয়ত আরও ক্ষতি হবে তাতে।" ডাক্তারের গলায় চিন্তার আভাস।

"বাঁচাও বাঁচাও। পারছি না।"

"শান্ত হও তরুণ। মনে হয় তোমার কোন ক্ষতি ও করবে না। মোটের ওপর শ্রীমতী স্ত্রীলোক। অতএব......।"

বহুদিন আগে মাকড়সার শিকার করা দেখেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তরুণ সত্যি স্ত্রী-মাকড়সার হাতে পড়েছে।

"আচ্ছা, কোন লোভনীয় খাবারের লোভ দেখালে হয় না?" আমি বললাম।

তিনটি হাতেই শ্রীমতী তরুণকে দোলাতে আরম্ভ করেছে। ছটফট করছে তরুণ।

"তরুণ, ছটফট করো না," বললে ডাক্তার। তারপর—"ভাল। ভাল বলেছ। কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ পেলে......।"

বাইরে কয়েকটা গাড়ী থামার আওয়াজ শোনা গেল। ডাক্তার ছুটে জানলায় চলে গেল। আমি শুনতে পেলাম সে বাইরের লোকদের ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলছে। তারপরেই অনিরুদ্ধকে আসতে দেখলাম। দমকলের একজন অফিসার ও একজন কর্মী তার পেছনে পেছনে এল। নীচের দিকে তাকিয়েই তাদের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।

"ওর অজান্তে ওকে ঘিরে ফেলতে হবে।"

"কাকে ঘিরে ফেলতে হবে? ও কি মানুষ না দৈত্য?"—কেঁপে উঠল অফিসারের গলা।

"ও কথা পরে ভাবলেও চলবে।" অধীরভাবে ডাক্তার বলল—"যদি কতকগুলো শক্ত দড়ি পেতাম······।"

"বাঁচাও।" তরুণের গলা আবার শোনা গেল। শ্রীমতী জোরে চেপে ধরল তরুণকে। শ্রীমতীর মুখ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ উঠছে। সেই বীভৎস আওয়াজে অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে যায়।

"উঃ কি ভয়ানক দৃশ্য!" অফিসারটি বলল।

"তাড়াতাড়ি করুন। একটা দড়ির ফাঁস এখান দিয়ে ফেলে দিলেই হবে।" আদেশ দিলে ডাক্তার।

দমকল কর্মীটি তাড়াতাড়ি একটা দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে এল। অফিসার নানাভাবে বোঝাতে লাগল কেমন করে ফাঁসে ধরতে হবে শ্রীমতীকে। আস্তে আস্তে ফাঁসটি নামিয়ে দিল। দুটো হাতের নীচে দিয়ে শরীরের ওপর চেপে বসল দড়ির ফাঁস।

শ্রীমতীর এতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। তখনও সে আদর করে চলেছে তরুণকে। এমন সময়ে নীচের সামনের দরজা দিয়ে কয়েকটা মুখ উঁকি মারল। কয়েকজন দমকল কর্মী ও পুলিশের লোকজন উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল সেই বীভৎস দৃশ্য। ওপর থেকে ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা দড়ির ফাঁস নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ আর একটা দড়ির ফাঁস নামাতে গিয়ে ঝুলন্ত আলোটা ঝন ঝন করে ভেঙে নীচে পড়ে গেল।

এতক্ষণে যেন শ্রীমতীর সম্বিৎ ফিরল। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে উঠল।

"না। এ আমার! একে আমি ছাড়বো না।" বীভৎস গলায় চীৎকার করে উঠল শ্রীমতী।

ওপর থেকে দমকলের লোকজন ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

কোনদিন দৃকপাত না করেই শ্রীমতী সোজা চলতে আরম্ভ করল। দড়ি ক্রমশঃ শক্ত হয়ে বস্‌ছে। আমাদের হাতে দড়ির প্রান্তভাগ ধরা রয়েছে। তাড়াতাড়ি দড়িগুলো একটা থামের গায়ে বেঁধে দিলাম। কিন্তু মড় মড় করে সেই থাম ভেঙে পড়ল। তরুণ চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সজোরে ধরে রেখেছে শ্রীমতী। চলন্ত বুলডোজারের মত বাইরের দরজার দিকে চলল। দেহের চাপে দরজা ভেঙে পড়ল।

"আমার আমার। একে ছেড়ে দেবো না আমি।"

আমরা জানলার কাছে ছুটে গেলাম। শ্রীমতী ইতিমধ্যে সমস্ত বাধা কাটিয়ে উঠেছে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম মত্ত জলহস্তীর মত থপ থপ করে চলেছে বাগানের মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী। তরুণ তার বুকে ঝুলছে। আর পেছনে প্রায় ১২জন দমকল কর্মী ও পুলিশ দড়ির প্রান্তভাগ ধরে তার গতিবেগ কমাতে পারছে না। ওদের হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে শ্রীমতী। বাগানের গেটটা মালী ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিয়েছিল। গেটের দিকে শ্রীমতী এগিয়ে আসতে দেখে মালী ভয়ে পাশের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। গেট বন্ধ থাক বা থাক শ্রীমতীর কিছু এসে যায় না। তার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। অল্প বাধা পেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই গেটটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। রাস্তায় উঠে পড়ল শ্রীমতী। তরুণ ঠিক এক অবস্থায় ঝুলছে। ছটফট করছে সেই লৌহ বাঁধনের মধ্যে।

বাইরে কোন গাড়ীর ইঞ্জিন সচল হয়ে উঠল। ডাক্তার ওপর থেকে তাদের থামতে বলল। আমরা কোন রকমে সেই ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। দমকলের গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

সিকি মাইল যাওয়ার পর রাস্তাটা ক্রমশঃ সরু হওয়াতে গাড়ী আর যেতে পারল না। আমরা গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। প্রায় দৌড়েই চললাম পথ ধরে। শ্রীমতীর যাওয়ার চিহ্ন পথে রয়েছে। পায়ের ছাপগুলো প্রায় ৬ ইঞ্চি বসে গেছে মাটিতে।

আমরা নদীর কাছে এসে পড়লাম। সামনেই পুরানো কাঠের ব্রীজ। তারই ওপর দেখলাম শ্রীমতীকে। সেই একই অবস্থায় তরুণ রয়েছে। হঠাৎ ব্রীজটা মড় মড় করে উঠল। শ্রীমতীর ভার সহ্য করতে পারল না ব্রীজ। শ্রীমতীর পায়ের নীচেটা ভেঙে গেল। শ্রীমতী নিজেকে সামলাতে গিয়ে তরুণকে ছেড়ে দিল। তরুণ আর শ্রীমতী একই সঙ্গে নদীতে পড়ে গেল। তরুণকে একজন পুলিশ সাঁতরে ডাঙায় তুলে নিয়ে এল। আর শ্রীমতী? খরস্রোতা নদীর জলের বিরাট আবর্তনে নীচে তলিয়ে গেল। "তরুণকে দেবো না, কিছুতেই দেবো না তরুণকে"—বলে শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠেছিল শ্রীমতী। কিন্তু এখন আর কোন চিহ্নই নেই তার। জলের ঢেউ আস্তে আস্তে বড় হতে হতে পাড়ের কাছে এসে মিলিয়ে গেল।

সর্বহারার মত নদীর পাড়ের ওপর ডাক্তার অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের সমস্ত সাধনার ফল তার চোখের সামনেই বিসর্জিত হয়ে গেল। পায়ের তলার শক্ত মাটি সরে গেছে ডাক্তারের। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল সে। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

আর আমার? কেন জানি না শ্রীমতীর জন্যে মনটা হু হু করে উঠল। তার সমস্ত বীভৎসতা, অপরাধ আর কিছুই মনে পড়ল না। শুধু মনে ভেসে উঠল কি অসীম আকুতি তরুণকে পাওয়ার জন্যে। নাই বা হল প্রাকৃতিক সৃষ্টি। নাই বা হল আমাদের মত রক্ত মাংসের মানুষ! তবুও কি তার হৃদয়ের আর্তিকে ভোলা যায়? মৃত্যু মুহূর্তেও সে ভোলেনি তরুণকে। এক অভিশপ্ত জীবের এই অমানুষিক ভালবাসার কোন মূল্যই কি নেই? কোন দাম কি নেই শ্রীমতীর মিলনের সেই ব্যর্থ প্রয়াসের?

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীমতীর আত্মার মঙ্গল কামনা করলাম। অবশ্য যদি তার আত্মা বলে কিছু থেকে থাকে।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীলীলা মজুমদারের-এর

প্রশংসাধন্য

জগদীশ প্রসাদ দাশের

নবতম উপন্যাস

হৃদয়ের স্বাক্ষর

॥ চার টাকা ॥

*—একটি সুন্দর এবং বিশুদ্ধ দেশপ্রেম 'হৃদয়ের স্বাক্ষরের' মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি লেখকের সাহিত্য সাধনার সাফল্য কামনা করি।

—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

*—লেখক যে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, অনেক গুণী ও প্রবীণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও সচরাচর তা দেখা যায় না।

—শ্রীলীলা মজুমদার (ঘরোয়া)।

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্
মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক
পোস্ট বক্স ২৫৩৭. কলিকাতা ১

প্রাগৈতিহাসিক দানব "গর্গো" কলকাতায় এসেছিল !

মেট্রোর ছবি—

গল্প পরের পাতাগুলিতে···

মেট্রো-গোলডুইন-মেয়ারের

গর্গো

সংক্ষিপ্ত সচিত্র কাহিনী

বিকট বীভৎস প্রাগৈতিহাসিক দানব সে। সবাই তাকে ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে, কাছে গিয়ে আঁৎকে উঠেছে—কিন্তু ভালবাসতে পারে নি।

কিন্তু ছোট্ট সেই ছেলেটা, যার বাপ নেই, মা নেই, ঘর নেই, কেউ নেই—সেই অনাথ নিরাশ্রয় ছেলেটা ভালবেসেছিল তাকে। বন্ধুর মতই দেখেছিল সেই শিশুদৈত্যকে। কাছে যেতে ভয় পায়নি, নাম ধরে ডাকতে পেছপাও হয়নি।

খোকাদানবের নাম 'গর্গো'। মেট্রোগোলডুইন-মেয়ার পরিবেশিত কিং ব্রাদার্স প্রোডাকসনসের অসাধারণ সায়ান্স-ফিকশ্যানের ফিল্ম-দৈত্য 'গর্গো'র সমকক্ষ দৈত্য বুঝি একমাত্র কিংকংই ছিল। ছবিটার মধ্যে আগাগোড়া উৎকণ্ঠা আর শিহরণ।

লণ্ডন শহর শ্মশান হয়ে গেল প্রাগৈতিহাসিক দানবের দাপাদাপিতে। বিশ্ববিখ্যাত বিগবেন, ওয়েষ্ট মিনস্টার অ্যাবি, হাউস অফ পার্লামেন্ট আর টেমসের বিশাল টাওয়ার ব্রীজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। দানবের রোষানলে পড়ে লোমহর্ষক সেই কাণ্ড দেখতে দেখতে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠার উপক্রম হবে।

জো রিয়ান আর স্যাম স্লেড দুজন অ্যাডভেঞ্চার-পাগল জোয়ানের নাম। আয়ার্লাণ্ডের উপকূলে সমুদ্রে ডোবা ধনরত্ন উদ্ধারের আশায় অভিযান চালিয়েছিল দুজনে কিন্তু সমুদ্র সম্পদের পরিবর্তে পেল

তারা এক অসাধারণ সামুদ্রিক রাক্ষসকে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল দানবটা।

'গর্গো' সেই দানোরই নাম। 'গর্গো'কে নিয়ে লণ্ডন ফিরে এল দুই বন্ধু। সঙ্গে এল একটি অনাথ ছেলে, নাম তার সীন। লণ্ডনে এসে একটা সার্কাসে 'গর্গো'কে রাখার ব্যবস্থা হল। হাজার হাজার লোক এসে দেখে যেতে লাগল প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ দানবকে।

সীন কিন্তু ভালবেসেছিল গর্গোকে। তবে ইচ্ছে থাকলে দানব-বন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার উপায় ছিল না তার। ঠিক এই সময়ে শোনা গেল সেই ভয়ংকর সংবাদ!

গর্গোর মা সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ছুটে আসছে লণ্ডনের দিকে!

আড়াইশ ফুট উঁচু সেই অতিকায় দানবের পথ আটকাতে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটল একটা ডেষ্ট্রয়ারের। আগুন ছুঁড়ে, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, এমন কি জেট প্লেন থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়েও কিছুতেই রোখা গেল না গর্গোর মাকে। এসে পৌঁছোলো সে লণ্ডন শহরে। তারপর শুরু হল ধ্বংস-পর্ব!

যাওয়ার পথে সবকিছুই লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ছুটে চলল সে সন্তানের দিকে।

তারপর? মা-দানবের সঙ্গে কি শেষ পর্যন্ত দেখা হয়েছিল শিশু-দানবের? সীন, রিয়ান আর স্লেডেরই বা শেষ পর্যন্ত হল কি?

রোমাঞ্চকর ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে পাওয়া গেছে উত্তর। এ ছবিতে শুধু শ্বাসরোধী দৃশ্যই নেই, আছে দুই শিশুর মধ্যে হৃদয় সম্পর্কের কাহিনী। মানব-শিশু ভালবেসেছিল দৈত্য-শিশুকে। নাটক জমে উঠেছে এই নিগূঢ় বন্ধু-প্রেমকেই কেন্দ্র করে।

ছবি তুলতে সময় লেগেছিল প্রায় দুবছর। নতুন ধরনের অটোমোশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল ফোটোগ্রাফিতে। রঙের বাহারও দেখবার মত। অধিকাংশ দৃশ্যই আয়ার্ল্যাণ্ডের উপকূলে

আর লণ্ডনের পথেঘাটে নেওয়া। ফোটোগ্রাফিতে অদ্ভুত এফেক্ট সৃষ্টি করেছেন টম হাওয়ার্ড—যিনি দু'দুবার অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন শুধু এই বিশেষ গুণের জন্যেই। প্রায় ১০,০০০ হাজার অভিনেতা-অভিনেত্রীকে জড়ো করতে হয়েছে 'গর্গো'র স্যুটিংয়ে।

প্রাগৈতিহাসিক দানোর চীৎকার

প্রাগৈতিহাসিক দানোর চেঁচানি কি রকম হওয়া উচিত? মা গজরাচ্ছে সন্তান কিডন্যাপ্‌ড্‌ হওয়ার রাগে; আর সন্তান কাঁদছে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার আকুলতায়।

আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডের সাউণ্ড লাইব্রেরী সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারল না। শেষকালে প্রোডিউসার কিং ব্রাদার্স'ই মাথা খাটিয়ে দানোর চীৎকার আবিষ্কার করে ফেললেন।

কি ভাবে? একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চার-চারটে বৃহত্তম জেট-প্লেন ছুটিয়ে দিয়ে রেকর্ড করে নেওয়া হল সেই বিকট আওয়াজ।

রুপালী পর্দায় এই গর্জন শুনেই হার্টফেল করার উপক্রম হয়েছিল অনেকের।

ফেণা-রাবারে গড়া দানো!

দু-দুটো প্রমাণ সাইজের দানো তৈরী হয়েছিল কি দিয়ে জানেন? ফেণা রাবার, আঁশযুক্ত কাঁচ, আর হাবিজাবি কত কি যন্ত্রপাতি দিয়ে। লণ্ডনের পথেঘাটে এরাই যখন হাত-পা ছুঁড়ে, চোখ ঘুরিয়ে, নিঃশ্বেস নিয়ে, ল্যাজ নেড়ে, চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়েছে—তখন গাড়ী-ঘোড়া আটকে সে এক এলাহি কাণ্ড। আর সে কি ভীড়!

লণ্ডনের রাস্তায়

বাড়ীঘরদোর চূরমার করার দৃশ্যগুলো অবশ্য তোলা হয়েছে ষ্টুডিওর মধ্যে ক্ষুদে মডেল ভেঙে। কিন্তু শহরের পথে আকাশ ছোঁয়া সেই দত্যিদের ভুলতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল লণ্ডনের বাসিন্দাদের।

শিশুদৈত্যের উচ্চতা বেশী নয়। মাত্র পঁয়ষট্টি ফুট; পিকাডিলি সার্কাস, রিজেণ্ট ষ্ট্রীট, ট্রাফালগার স্কোয়ার আর হোয়াইট হলে বরাবর সাত মাইল পথ প্যারেড করে আসতেই পথেঘাটে যানবাহন দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাটারসী প্লেজার গার্ডেনে গেট ভাঙতে হল ২৫০ ফুট উঁচু গর্গোর মায়ের পথ তৈরী করতে।

ষ্টুডিওর মধ্যে

এম জি এম-য়ের বৃহত্তম ষ্টেজ (বোরহ্যামউডে) টেমসের টাওয়ার ব্রীজের মডেল তৈরী করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল ওয়েষ্টমিনষ্টার আর হাউস অফ পার্লামেণ্টের মডেল। মোট খরচ পড়েছিল প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। গড়তে সময় লেগেছিল দশ হপ্তা। কিন্তু মাত্র দশ মিনিটে সব ভেঙে চুরে তছনছ করে ফেলল গর্গো। কপাল ভালো, একবারেই ভালো ছবি উঠেছিল। খারাপ উঠলে, আবার সাড়ে দশ লক্ষ টাকা খরচ করে সেট তৈরী করতে হত।

ষ্টাণ্ট গার্ল কনি

জ্বলন্ত বাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়া, লণ্ডন ব্রীজ থেকে টেমস নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া, খাদের মধ্যে গাড়ী নামিয়ে দেওয়া আর চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে নেমে পড়ার দুঃসাহসিকতায় জুড়ি মেলা ভার ইংল্যাণ্ডের পয়লা নম্বর স্টাণ্ট গার্ল কনি টিলটনের।

কিন্তু সেই ডানপিটে মেয়েই আহত হল 'গর্গো'র সুটিংয়ে। কি ভাবে জানেন? ষ্টুডিওর মধ্যে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে!

কিং কং না, টিকটিকি-দানো, না, ড্রাগন-দত্যি?

গর্গোর মায়ের উচ্চতা ২৫০ ফুট, বুক ১০০ ফুট, উরু ১৫০ ফুট। কিং ব্রাদার্সের ভাষায়—"গর্গো আর তার মা-ই সর্বপ্রথম মানব-সৃষ্ট দানব।" কারণ ওদের কান্না, ওদের রাগ, ওদের ভাষা নাকি মানুষের হৃদয়েও দোলা দেয়। সেই জন্যেই শেষ পর্যন্ত বাচ্ছাকে নিয়ে সমুদ্রে ফিরে যেতে দেওয়া হয়েছিল গর্গোর মাকে।

সিনেমা-দানোর ইতিহাস

চলচ্চিত্র যখন শৈশবের পর্যায়ে, তখন কিন্তু সিনেমা-দানোর এত উন্নতি ঘটেনি। এরকম বাস্তব আর বুক কাঁপানো ছবি তোলাও সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্যান্ত প্রাণী নিয়েই কাজ সারতে হয়েছে। ১৯০৭ সালে মাত্র এক রীলের রোমাঞ্চ হাজির করলেন এডুইন পোরটার। ছবির নাম 'দি ঈগল্স্ নেস্ট'। ছবিতে দেখা গেল, বিশাল একটা পাখী একজন মানব-শিশুকে তুলে নিয়ে উড়ে গেল দিগন্তে। দিগন্ত অবশ্য পটে আঁকা হয়েছিল। ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ নামে এক অভিনেতাই শেষ পর্যন্ত শিশুটিকে উদ্ধার করে আনেন। চলচ্চিত্রে দানব দেখিয়ে এডুইন পোরটার তাই পথিকৃৎ।

বছর দুয়েক পরেই তৈরী হল 'গার্টি দি ডাইনোসর' নামে একটি ছবি। ছবি তুললেন খবরের কাগজের ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী উইনসর ম্যাকে। বস্তুত, সিনেমায় ডাইনোসর দ্বিতীয়বার যিনি দেখান, তিনি ওয়াল্ট ডিসনী। 'ফ্যানটাসিয়া' ছবিতে ষ্ট্র্যাভিনস্কির "দি রাইট অফ স্প্রিং" অধ্যায়ে এই ডাইনোসর আনা হয়।

এরপরে ক্লাসিক ছবি তোলার হিড়িক শুরু হল হলিউডে। তাই সৃষ্টি হল 'মবি ডিক' (দামাল তিমির কাহিনী)। ১৯২৬ সালে জন ব্যারিমুরের ছবি 'দি সী বিষ্ট' তখনকার দর্শক সাধারণের মধ্যে গভীর দাগ কাটল। ১৯৩০ সালে ইনিই আবার তুললেন 'মবি ডিক'। কয়েক বছর আগে গ্রেগরী পেককেও তৃতীয়বারের 'মবি ডিক'য়ে দেখা গেছে।

তবে আধুনিক যুগের দানো-সিনেমার জনক হল কিং কং। ১৯৩৩ সালে সেই বিশাল গরিলা-দৈত্যের হুহুংকার আজও কেউ ভুলতে পারেন না। বছর পনেরো পরে তোলা হল 'মাইটি জো-ইয়ং'। এ ছবিতেও অতিকায় এক নরবানরের আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক হয়ে থাকতে হয়েছে সবাইকে।

আকাশে বাতাসে, সমুদ্রে, বনে প্রান্তরে সর্বত্রই দৈত্য সৃষ্টি

করেছেন সিনেমার দানো-কারিগররা। 'গর্গো'র পরিচালক ইউজিন লরীও এর আগে তুলেছেন 'দি বিস্ট ফ্রম দি ২০,০০০ ফ্যাদম্‌স্'।

সিনেমা-দানোদের অনেককেই অবশ্য দেখতে মানুষের মতই। ক্লাসিক উদাহরণ হল 'ফ্র্যানকেন্সটাইন'—বরিস কারলফ সৃষ্ট রবট দৈত্য। এবং বেলা লুগোসির রক্তশোষক পিশাচ 'ড্রাকুলা'।

কিন্তু সর্বকালে মানুষ-পিশাচদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে "ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইড"। অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসটি 'আশ্চর্য!' ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। প্রথম ছবিটি ছিল নির্বাক। দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেন জন ব্যারিমুর। একই ভূমিকায় ১৯৩২ সালে অভিনয় করে ফ্রেডরিক মার্চ অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ সালে আবার ছবিটি তোলা হয়—এবার অভিনয় করেন স্পেনসার ট্রেসি।

'গর্গো' নামের ইতিহাস

শব্দটা এসেছে গর্গনচুয়া থেকে। যার চুল মানেই বিষধর সাপ, সেই মেডুসার আর তার বোনেদের বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনী 'গর্গন' এর গ্রীক উচ্চারণও 'গর্গো'।

'গর্গো' কলকাতায় এসেছিল মেট্রো সিনেমায়। আবার আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং গর্গো বৃত্তান্ত পড়ে যাঁরা শিহরিত হলেন, তাঁরা এখন থেকেই দিন গুনুন।

টুকরো খবর

সায়ান্স-ফিকশ্যন পড়া যাঁদের নেশা, তাদের জন্যেই একটা ঠিকানা দেওয়া হচ্ছে নীচে। 'রেসুড়ে' যেমন রেসে না গিয়ে পারেন না, 'নেশুড়ে'ও তেমনি এই ঠিকানায় চিঠি না লিখে পারবেন না :

SF Book Club
Phoenix House Ltd
10-13, Bedford Street, Strand,
London, W.C. 2

অবিশ্বাস্য, কিন্তু···!

অজিত কুমার বর্ধন

এক্ টুকরো হাড়

দু ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া একটা ফ্যাকাশে শুক্‌নো হাড় পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোককে এক অনৈসর্গিক ও অলৌকিক শক্তিবলে মন্ত্রমুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রেখেছে। এই হাড়টি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধের নিজস্ব দাঁত ব'লে প্রায় সাত কোটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আন্তরিকভাবে বিশ্বসে করে থাকেন।

সিংহলের ক্যালডি শহরের বিখ্যাত দন্তমন্দিরে একটি মৃদু আলোকিত বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে হাড়টি সুরক্ষিত আছে। হাজার হাজার রকমের ফুলের গন্ধে এই ঘর আমোদিত। একটি বিরাট রূপোর টেবিল—চারিদিকে সোনার শেকল ও চুণী-পান্না সাজানো। ঠিক মাঝখানে একটি সোনার পদ্মফুলের ওপর পবিত্র দাঁতটি সুশোভিত।

এই গৌরবোজ্জ্বল পবিত্র দাঁতটির একটি ইতিহাস আছে। যিশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় পাঁচশো তেতাল্লিশ বছর আগে ভগবান বুদ্ধদেবের চিতা থেকে এই পবিত্র বস্তুটি সংগৃহীত হয়েছিল। আট শো বছর পরে এটি দক্ষিণ ভারত থেকে সিংহলে নিয়ে আসা হয়। কোনও এক সুন্দরী সিংহলী রাজকুমারীর বিবাহের যৌতুক হিসাবে এটি বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। পৃথিবীর কোন মেয়েই এর চেয়ে কোনও মূল্যবান জিনিষের জন্য গর্ববোধ করতে পারে না।

ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্তুগীজেরা এটা দখল করে এবং বিধর্মীয় ঘৃণাবশত সকলের সামনে ধ্বংস করে ফেলে। দাঁতটাকে পুড়িয়ে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে গুঁড়িয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়। অক্ষত

অবস্থায় তা ফিরে পাবার জন্য গোয়ার বিশপকে এক কোটি টাকা মূল্যের সোনার তাল দিতে চাওয়া হয়েছিল। বিশপ ঘৃণাভরে তা উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

দাঁতটি ধ্বংস করার পর মুহূর্তেই সিংহলের শাসকগণ ঘোষণা করলেন যে, ধ্বংস করে ফেলা দাঁতটি ছিল নকল। ওটি আসল নয়। আসল দাঁতটি তাদের অধিকারেই আছে।

এই ভয়াবহ অভিজ্ঞানটিকে দূর থেকে দর্শনের জন্য পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লক্ষ-লক্ষ নরনারী আজও এখানে জমায়েৎ হয়ে থাকেন। তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে সোনা, রূপা, মণি-মুক্তো, নানাবিধ রত্ন ও মহামূল্যবান উপহারাদি এখানে নিবেদন করেন।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে না কি যে, পৃথিবীর প্রত্যেক পাঁচজনের একজন মানুষ এই বস্তুটিকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শুদ্ধ, পবিত্র, গৌরবময় ও অমূল্য পদার্থ বলে মনে করে থাকেন?

ফটো তুললেই মৃত্যু

ফটো তোলার সংগে সংগেই লোকটা মরে যাবে। এই পারমাণিক যুগে বিজ্ঞান মনোভাবাপন্ন লোক চট করে কি এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন? না, এ কখনও সম্ভব হয়? হ্যাঁ, সম্ভব হয়।

সম্মিলিত ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মতো এক দেশ—নাম ইয়েমেন, দক্ষিণ আরবদেশে অবস্থিত। এই ইয়েমেনের রাজা ইমাম ইয়াহিয়ার বেলায় এইরকম ব্যাপার ঘটেছিল। উনিশশো আটচল্লিশ সালের বিশে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকার একটি খবরের কাগজে এক খবর ছাপা হয়েছে দেখতে পাওয়া গেল। খবরটা এই—"রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে ইয়েমেনের রাজাই একমাত্র লোক—যাঁর ফটো আজ পর্যন্তও তোলা হয় নি। তিনি তুলতেও দেন নি। যে তুলবে তাকে এর জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে।"

ইমাম ইয়াহিয়া কাউকেই তাঁর ফটো তুলতে দেন নি। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, যদি কোনদিন তাঁর ছবি তোলা হয় এবং

সাধারণে প্রকাশ করা হয়, তাহোলে তাঁর মৃত্যু হবে। ক্যামেরা-ম্যানকে তিনি নিষেধ করতে পারতেন; কিন্তু মন থেকে আঁকার ক্ষমতা থেকে তিনি চিত্রশিল্পীদের নিষেধ করতে পারেন নি। ইটালী দেশের এক চিত্রকর রাজাকে এক ঘণ্টা ধরে ভালো করে দেখার পর। বিরাশী বছরের এই রাজার একটি জীবন্ত মানুষ-প্রমাণ ছবি এঁকে ফেলেন।

যে দিনই এই ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোল, সেইদিনই কায়রো থেকে একটি সংবাদও প্রচারিত হোল—"ইয়েমেনের রাজা ইমাম ইয়াহিয়া এবং তাঁর তিন পুত্র গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন।"

ঠিক যে সময়টিতে আমেরিকার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলো প্রকাশিত হয়, ঠিক সেই সময়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। কি বলবেন এই ঘটনাকে?—অনৈসর্গিক, অলৌকিক, অদ্ভুত, বিচিত্র, আশ্চর্য না কাকতালীয়?

প্রকাশিত হলো

কিংবদন্তির প্রেমকথা

'নবফুল' সংকলিত বৌদ্ধ প্রেমকাহিনী

দাম ২'৫০ (ডাকব্যয় ৮১ প.)

★

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌

মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

পোস্টবক্স ২৫৩৯, কলিকাতা ১

বিরাট ধাতব দরজাটা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হলো···দেখা গেল ধূসর পটভূমি !

সময়ের প্রবেশপথে

বিশ্বদীপা

অধ্যাপক সান্ন্যাল পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে শরীরটা রকিং চেয়ারে দোলাতে দোলাতে ব'ললেন "মানুষের সামনে আজ যে মহান সমস্যাটা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে আমি সেটার সমাধান ক'রতে চাই। মহাশূন্যে অভিযান, শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'য়েছে, তুষার মেরুকে বাসের উপযোগী ক'রে তোলার পরিকল্পনা হ'য়েছে বিফল। জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী চালু ক'রেও কিছু হয়নি। জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত হচ্ছি আমরা। ভদ্রমহোদয়গণ—," হঠাৎ কথা থামিয়ে সমবেত রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারদের দিকে তাকালেন তিনি। "এর একটি মাত্র উত্তর হ'তে পারে।"

"গণ বিধ্বংস?" জিজ্ঞেস ক'রলেন একজন রিপোর্টার।

"না, তা নয়!", গুন গুন ক'রে ব'ললেন অধ্যাপক। "উত্তরটা হচ্ছে—সময়!"

"সময়?"

"ঠিক তাই," ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন অধ্যাপক সান্ন্যাল। নাটকীয় ভঙ্গীতে লাল ভেলভেটের পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিলেন তিনি—দেখা গেলো চকচকে একটা ধাতব দরজা। "এটাই তার সাক্ষী!"

"এটা আবার কি জিনিষ?", বেচারা রিপোর্টার হতভম্ব।

"এটা!" একটু তিক্তকণ্ঠে ব'ললেন অধ্যাপক, "প্রোফেসার সান্ন্যালের 'সময়ের প্রবেশ পথ' অর্থাৎ টাইম ডোর।"

"মানে, টাইম মেশিন?"

"না, তা নয়। সাধারণ লোকেও জানে যে টাইম মেশিন একটা অবাস্তব জিনিষ, অসার কল্পনা! যাইহোক—" অধ্যাপক পাইপ থেকে পোড়া তামাকটা ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। 'অত্যন্ত জটিল গণিতের একটি সূত্রকে কাজে লাগিয়ে আমি এই "সময়ের প্রবেশপথ' যন্ত্রটি আবিষ্কার ক'রেছি। দরজাটা খুলে একটু ওপরে উঠুন সিঁড়ি দিয়ে—ব্যস, অতীতে চলে যাবেন আপনি!"

"অতীতে মানে, কত দূরে?"

অধ্যাপক রিপোর্টারদের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাইলেন। "ভদ্র-মহোদয়গণ, এই দরজার পেছনে আছে বিস্তীর্ণ স্থান—সেখানে পৃথিবীর বাড়তি লোক সংখ্যার স্থান সংকুলান হ'য়ে যাবে অনায়াসে!" আঙুল নেড়ে ব'ললেন তিনি, "আমি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ছোটনাগপুরের কথা ব'লছি।"

"কিন্তু সেখানকার লোকেরা যদি জায়গা ছাড়তে রাজী না হয়?"

"তাদের মতামতের কোন মূল্য নেই। সময়ের প্রবেশ পথ দিয়ে কেবল ভেতরেই যাওয়া যায়, বেরুনো যায় না। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কোন লোকের পক্ষে ২০৬৩ খৃষ্টাব্দের পৃথিবীতে পুনঃ-প্রবেশ অসম্ভব; আমি জানি। অতীতের বুকেই র'য়ে গেছে তারা।"

আধুনিক পোষাকগুলো খুলে ফেললেন অধ্যাপক সান্ন্যাল। তার নীচে দেখা গেলো পুরোনো দিনের সাঁওতাল উপজাতির সর্দারের মত পোষাক। মুখে একটা বিচিত্র দর্শন মুখোশ এঁটে নিলেন, এবং হাতে নিলেন লম্বা বর্শা, আর চিত্র বিচিত্র করা ঢাল। ধীরে ধীরে এগোলেন তিনি 'সময়ের প্রবেশপথে'র দিকে।

সাদা হাতলটা ধ'রে ঘুরিয়ে দিতেই বিরাট ধাতব দরজাটা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হ'লো। দরজার ভেতরে দেখা গেলো ধূসর পটভূমি। পেছনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অধ্যাপক একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই দিকে।

রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারের দল নোটবুক আর ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে এলেন সামনের দিকে ; সবাই তৈরী। "আপনি ভেতরে ঢোকবার পর যদি দরজাটা বন্ধ হ'য়ে যায়, তবে ?" জিজ্ঞেস ক'রলেন একজন।

"এ ভয় অমূলক", আশ্বাস দিলেন অধ্যাপক। "আমি দেখেছি 'সময়ের প্রবেশ পথ' কখনও বন্ধ হ'তে পারে না। বিদায় ভদ্রমহোদয় গণ...!"

অধ্যাপক সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন—এক পা দরজার ভেতরে দিতেই সবাই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলেন, অবিশ্বাস্য একটা কিছু ঘটবে ব'লে।

এক···দুই···ক'রে অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেলো। কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রছে সবার। চোখের পলক প'ড়ছে না কারও···।

কিন্তু, অধ্যাপক সান্যাল যেমন ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন —অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন না।

মিট্ মিট্ ক'রে সকলের দিকে চাইলেন। বিরক্তিতে কপাল কুঞ্চিত হ'লো তাঁর। ধূসর দেওয়ালটার গায়ে বার কয়েক জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে গুন্ গুন্ ক'রতে ক'রতে রকিং চেয়ারটাতে এসে ব'সলেন।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'ললেন, "আমি হেরে গেলাম!" হতাশার স্বর অধ্যাপকের কণ্ঠে। "প্রোফেসার সান্যালের 'সময়ের প্রবেশপথ' একটা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

কম্পিত দুই হাতের মাঝে মাথা গুঁজলেন অধ্যাপক সান্যাল।

রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারের দল রাগে গজ্ গজ্ ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে আসতে লাগলেন ল্যাবরেটারী থেকে।

হঠাৎ মাথা তুলে আদেশের সুরে অধ্যাপক ব'ললেন, "শুনুন!"

মৃদু একটা গর্জনের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো সময়ের প্রবেশ

পথের ধূসর পর্দার পেছন থেকে। বহুদূরাগত সেই শব্দ একটু একটু ক'রে বাড়তে লাগলো। ক্ষীণ একটা খট্ খট্ শব্দ গর্জনের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগলো। শব্দটা শেষে হ'য়ে উঠলো অনেকগুলো ঢাক একসাথে পেটানোর শব্দের মত—তারপর মনে হ'লো যেন বজ্রের সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ এগিয়ে আসছে দুর্বার গতিতে। সব কিছু এক্ষুণি ধ্বংস হ'য়ে যাবে…!

ভয়ে, রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফরা যে দিকে পারলেন দৌড়-লাগালেন।

"আবার ঝামেলা", রকিং চেয়ারে দুলতে দুলতে স্বগতোক্তি ক'রলেন অধ্যাপক সান্ন্যাল। "ছোটনাগপুরের জঙ্গল থেকে ধ'রে আনা হরিণগুলো ল্যাবরেটারীর মধ্যে আবার ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে!"

অ্যাল্‌ফা-বিটার নাটক অভিনয় করুন…

যমালয়ে ১৯৯৭ নকুল মুখোপাধ্যায় ১'৭৫

মুক্তি সংগ্রাম অজিত সেনগুপ্ত ১৲

নতুন জীবন অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৪'৭৫

শিগ্রী বেরুবে ঃ

অমৃতস্য পুত্রা অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৲

*

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

কলিকাতা

আ-৩৭-৭

লোকটার মুখে শয়তানের মত ছুঁচোলো দাড়ি…হিংস্র চোখ…
শব্দ দিয়ে সম্মোহন…সে কি কাণ্ড !

রুট-৩৪

অগ্নিমিত্র চট্টোপাধ্যায়

খবরটা এল মাঝরাতে। সমস্ত ঘর উদ্ভাসিত হয়ে গেল আলোয়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সজ্জিত হয়ে নিলাম। ঘরের টেলিস্ক্রীনে ফুটে উঠল আন্তর্গ্রহ ভ্রমণ নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান অফিসারের মুখ, ভয়ে সাদা, বললেন, "রিক, তাড়াতাড়ি অফিসে চলে এস। এই মাসে এই ছ'বার রুট-৩৪ এর মালবাহী রকেট থেকে কে বা কারা সমস্ত মাল লুঠ করে নিয়ে গেছে!"

২১৩৫ সাল। মানুষ এতদিনে মহাকাশে লক্ষাধিক গ্রহ জয় করে তাদের অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। তবুও মানুষ সব স্থানেই সব কাজেই, বিশেষতঃ ব্যবসা বাণিজ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এখন পৃথিবীবাসীদের এই গ্রহভ্রমণ নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান কাজই হ'ল, মহাকাশযানে করে ধনধান্যপুষ্পে ভরা গ্রহগুলি থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে নিয়ে এসে, বিভিন্ন গ্রহে যে যে সম্পদের অভাব, অন্যগ্রহের সেই সম্পদ দিয়ে পূরণ করা। এই দপ্তরটি কিন্তু অতিকায় একটি চাকতি; সৌরজগতের কয়েক হাজার মাইল বাইরে এটি ঘুরছে তার পাঁচ লাখ পৃথিবীর অধিবাসী ও হাজার হাজার মালবাহী মহাকাশযান নিয়ে। আমি এই দপ্তরের একজন বিশেষ গোয়েন্দা, নাম রিক সরকার।

নিস্তব্ধ করিডর দিয়ে হেঁটে গিয়ে যখন গ্রহভ্রমণ নিরাপত্তা দপ্তরের অফিসে পৌঁছলাম, তখন ভেতরে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। আমি

ভেতরে ঢুকতেই এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। ইনিই এই মহাকাশ স্টেশনের এবং সমগ্র নিরাপত্তা দপ্তরের হর্তাকর্তা বিধাতা। এসে বললেন, "রিক, তোমাকে দেখে খুসি হ'লাম। ব্যাপারটা আবার ঘটেছে—আরেকটি রুট-এর মহাকাশযান থেকে কোনও গ্রহ সব মাল লুঠ করেছে।"

"আবার?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ, আবার," তিনি বললেন, "আবার আগেকার মতই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পাইলট রেডিওতে অন্যান্য লুণ্ঠিত জাহাজের চালকদের মতই জানিয়েছে যে, তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই কি করে মাল অদৃশ্য হয়েছে।" তারপর একটু থেমে বললেন, "কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাশূন্য থেকে মালবাহী জাহাজটি এসে পড়বে, তখন……"

অফিসেরই একজন কর্মচারী তার স্পেসস্ক্যানার যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে বলল, "ও স্টেশনে এসে পড়েছে, স্যার।"

"ওকে অফিসে নিয়ে আসতে বল।" গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করলেন অফিসার। তারপর বললেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, কেসটা ঠিক আগের মতই হ'বে। আমরা পাইলটকে নানা ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, সত্য কথা বলাতে চেষ্টা করব. কিন্তু সববারের মত এবারেও কোন ফল হ'বে না। যে রকেটগুলি রুট-৩৪-এ যাচ্ছিল সেগুলি থেকে ছ'ছয়বার মাল চুরি গেছে, কিন্তু এখনো আমরা জানি না কি করে, কখন, কোথায় তা সম্ভব হয়েছে।"

*　　*　　*　　*

প্রশ্ন করার ঘরে শীঘ্রই পাইলটকে নিয়ে আসা হ'ল এবং তাকে নানা প্রশ্ন করে সত্য অন্বেষণ করবার চেষ্টা চলল, কিন্তু সুবিধাজনক কোন ফলই হ'ল না।

অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখলে রিক, আমি কি বলেছিলাম।"

"হ্যাঁ" বললাম আমি, "উত্তর শুনে তো মনে হচ্ছে ও সত্য কথাই বলছে।" হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা, লুণ্ঠনকারীরা যদি মাল নেওয়ার সময়ে ওকে সম্মোহিত করে থাকে?"

"সে কথা ভেবে আমরা কি কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিনি?" বললেন প্রধান অফিসারঃ "কিন্তু ওতে কোন ফল হয়নি। সব পাইলটদেরই অনেকদিন ধরে কষ্টকর সম্মোহন এড়ানো কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে দৃষ্টিশক্তিকে এমনভাবে সংযত করে রাখতে, যাতে সম্মোহন শক্তি ওদের চোখের ভেতর দিয়ে স্নায়ুর ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। সুতরাং সম্মোহন শক্তি এর মধ্যে নেই।"

অফিসে ফিরে এসে অফিসার বললেন, "এই রহস্যভেদ করার একটিমাত্র পথই আছে, রিক। আমি চাই তুমি একটি মালবাহী মহাকাশযানের পাইলট সেজে রুট-৩৪ ধরে যাও। তোমার কোনই অসুবিধা হবে না। কারণ রুট-এর মধ্যে যে যে গ্রহ পড়ে, ওদের প্রত্যেকটিতে মানুষেরই মত দেখতে ও বুদ্ধিমান জীব বাস করে। একটু আধটু অন্যরকম হ'লেও ওরা সবাই প্রায় এক। এছাড়া যারা মাল নেয় তারা প্রত্যেকেই পৃথিবীর জাতীয় ভাষা ইংরেজী বলতে অভ্যস্ত।* তোমাকে তিন ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে তুমি পাইলটের বেশে সজ্জিত ও আদব কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে নাও। তারপর উড়ে যাও রুট-৩৪ ধরে লুণ্ঠনকারীদের খোঁজে। তোমার যাত্রা শুভ হোক।"

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়েও বারে বারে মনে হতে লাগলো যে সম্মোহন শক্তিই এই রহস্যের একমাত্র চাবিকাঠি। তিনঘণ্টা পরে পাইলটের সাজে সজ্জিত ও সম্মোহন এড়ানো বিদ্যায়

*২০৬৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র মিলে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং তারা বহুল প্রচলিত ইংরেজী ভাষাকেই জাতীয় ভাষা হিসেবে মেনে নেয়।

গুপ্ত হয়ে আমি মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে একটি মালবাহী মহাকাশযানে করে উড়ে চল্‌লাম।

যাত্রাপথ—বিপজ্জনক রুট-৩৪।

কার্য—লুণ্ঠনকারীদের খুঁজে বার করে ধরা।

*　　　*　　　*　　　*

আন্তগ্রহ মহাশূন্য সময় অনুযায়ী দুঘণ্টা পরে আমি রুটের প্রথম স্টপ বিটা সেণ্টুরিয়াসে এসে নামলাম। সেখানে ডানাওয়ালা মানুষের বাস। দুজনে এগিয়ে এসে বল্‌ল, "তুমি এসেছ দেখে আমরা খুব খুসী হয়েছি। আমাদের হাসপাতালগুলোতে পোলোনিয়ম ও ইরিডিয়মের ভীষণ অভাব ঘটেছে।"

"তোমাদের জন্য যা এনেছি তাতে তোমাদের দুমাস অনায়াসে চলে যাবে।" আমি বল্‌লাম। তারপর হিসাব নিকাশ করে ২০ মিনিটের মধ্যে আবার মহাশূন্যে উঠে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম যে এই মালবাহী মহাকাশযানগুলি বিভিন্ন জগতে যে সাহায্য করছে, তার তুলনা হয় না।

তারপরে নামলাম নীল গ্রহ নবলামডাতে। এখানকার অধিবাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখলে পৃথিবীর মধ্যযুগের লোকেদের কথা মনে পড়ে যায়। তফাৎ শুধু এই যে এরা তলোয়ারের বদলে ব্যবহার করে রশ্মি-পিস্তল, দুর্গের বদলে বাস করে বিরাট সব অত্যাধুনিক প্রাসাদে ও ঘোড়ার বদলে চড়ে বেড়ায় ছোট ছোট রকেটে। তাদেরই একজন এসে সব মাল নামিয়ে নিলে। জিজ্ঞাসা করলাম "কিরকম চলছে এখানে?"

উত্তর পেলাম—"জিল্‌মোর বিদ্রোহ দমনের পরে নূতন কিছুই নয়। এদের মধ্যেও সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলাম না।"

উড়ে চললাম পরের গ্রহের দিকে। উপলিসনে এসে পৌঁছলাম। অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখতে এখানকার লোকেরা। চুলগুলো সব সাদা। হ্যাচ্‌ খুলে যখন নামলাম, তখন ভীষণ গরম লাগলো, কুলকুল করে

থামতে লাগলাম। একজন লোক এসে মাল নামিয়ে নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম "খুব গরম তোমাদের এখানে, না?"

"কোথায় গরম?" সে বল্‌ল, "এবার শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়েছে।" শুনে আমি তো হতভম্ব! এই অদ্ভুত গরম দেখে আমার মনে অনাবশ্যক সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল—কিন্তু লোকটি আর কোন কথা না বলে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভয়টা যে অনাবশ্যক বুঝতে পারলাম। এখনও পর্যন্ত কেউ কিছু লুণ্ঠন করার চেষ্টা করল না দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আবার উড়ে চললাম পরের গ্রহের দিকে। পরের গ্রহ দ্বিতীয় প্রক্সিমা। অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় গ্রহ। মহাকাশযান নামার পর হ্যাচ্ খুলতে খুলতে মনে হোল যে, এই গ্রহে কোনরকমেরই বিপদের সম্ভাবনা নেই। প্রক্সিমাই এই ছায়াপথে একটি মাত্র গ্রহ যেখানে কোনও অস্ত্র রাখা হয় না। অন্য গ্রহগুলি যদি এমন শান্তিপ্রিয় হোত!

একদল লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মধ্যে থেকে তিনজন এগিয়ে এলো। বললাম, "তোমাদের চার মাসের গ্যালিয়ম এনেছি। এই কাগজের তলায় সই করে তোমাদের মাল নামিয়ে নাও।"

একটি লোক কাছে এলে। শয়তানের মত তার ছুঁচোলো দাড়ি গোঁফ। মুখে একটি হিংস্র শয়তানি ভাব মাখানো। সবাইর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে লক্ষ্য করলাম, সবাই একরকম দেখতে। খুব অবাক হয়ে ভাবলাম, এত নিরীহ গ্রহের অধিবাসীদের মুখে বিধাতা এ কিসের ছাপ এঁকে দিয়েছেন?

এগিয়ে আসতে আসতে সে বললো, "আমরা খুসী হয়েছি তুমি এসেছ বলে। আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তুমি যে গ্যালিয়ম এনেছ আমরা তা ব্যাবহার করতে পারি···" তার মুখে খেলে গেল একটি শয়তানি হাসি, "আর ব্যবহার করতে পারি জাহাজের অন্য সব মাল। জেনন্, সমস্ত জাহাজটি খালি কর।"

আমার ওপর বজ্রাঘাত হলেও আমি এতটা চম্‌কাতাম না। তাহলে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ারই কাজ এটা। মুখ হাঁ হয়ে গেল আমার। মুখ হাঁ করেই বললাম, "কী,—কী করতে চাইছো তোমরা! তোমরা কি এই মহাকাশযানটি লুঠ করতে চাইছো?"

"ঠিক ধরেছ তো?" বললো একজন।

"পৃথিবীর সাধারণ মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান।" ব্যঙ্গ করলো দ্বিতীয় জন।

আমি বললাম, "তোমরা কি করে ভাবছো এ কাজ করে ছাড়া পাবে? যখন অন্য গ্রহগুলি তোমাদের দুষ্কর্মের কথা শুনবে তখন তোমাদের বয়কট করবে। তোমাদের গ্রহের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করাটাও স্বাভাবিক।"

"সেইখানেই তুমি ভুল করছ", বলল প্রথমজন, "আমাদের কিছুই হ'বে না কারণ কেউ জানবে না আমরা জিনিসপত্র লুঠ করেছি।"

"তারা জানবে না," বলল দ্বিতীয়জন, "কারণ আমরা তোমাকে হিপনোটাইজ করে দেব, যেমন আমরা অন্যান্য পাইলটদের করেছি। আমাদের গ্রহে সম্মোহন বিদ্যার খুব উন্নতি হয়েছে।"

"তাই জন্যে" বলল তৃতীয়জন, "আমরা সাধারণ যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করি না—সম্মোহনই হ'ল আমাদের অস্ত্র।"

"কিন্তু" আমি বললাম, "সব মালবাহী যানের চালকদের এমন-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে করে তারা সম্মোহন শক্তিকে এড়াতে পারে—এড়াতে পারে চোখকে বিশেষভাবে সংযত করে। তোমরা কি করেই বা তাদের সম্মোহিত করেছিলে, আর ভাবছো আমাকেও করবে?"

"মূর্খ" তৃতীয়জন বলল, "আমরা আর প্রাচীন 'চোখের-মধ্য-দিয়ে সম্মোহন' প্রথা ব্যবহার করি না, আমরা সম্মোহন করি প্রচণ্ড কম্পন-শীল শব্দ-তরঙ্গ দিয়ে।" হাতের একটা ছোট বাক্স দেখিয়ে বলল, "এই মুহূর্তেই এই যন্ত্র, যার গঠন-কৌশল এই গ্রহে আমরা তিনজন

ছাড়া কেউ জানে না, এ থেকে একরকম বিশেষ ধরনের শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে তোমাকে সম্মোহিত করে ফেলছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই···অ্যাঁ!"

"সেইটাই খালি আমি জানতে চাইছিলাম" বলতে বলতে আমি হোল্‌স্টার থেকে ততক্ষণে রশ্মি-পিস্তল টেনে বার করে তাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে বললাম, "তোমাদের তিনজনকেই আমি বন্দী করলাম। যে কটা মাল তোমাদের লোকেরা বার করেছে সব আবার ঢুকিয়ে দিতে বল, সঙ্গে ঢুকিও এ গ্রহের সব কটি সম্মোহন যন্ত্র। তারপর তোমরা তিনজনে আমার সঙ্গে মহাকাশযানে উঠে এস। আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তোমরা যদি আমাকে আর কোন বিপদে ফেলতে চাও" আমি ভালো করে তাগ করে বললাম, "চেষ্টা করো। আমি কিন্তু এক মুহূর্তেও সময় নষ্ট করবো না তোমাদের এ ব্রহ্মাণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।"

*　*　*　*　*

আড়াই ঘণ্টা পরে যখন মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বন্দী করে আবার মহাকাশ স্টেশনের দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন একজন বন্দী আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কিন্তু, আমরা এখনও বুঝতে পারছি না তোমার কান কি করে আমাদের প্রচণ্ড কম্পনশীল শব্দ তরঙ্গকে এড়িয়ে গেল!"

ভাগ্যক্রমে অপরাধীরা প্রথম থেকে সব কথা ভেবে দেখে না—তা' যদি দেখতো তাহলে গোড়া থেকে তারা অপরাধী-ই হো'ত না।

উত্তরে বল্‌লাম—"তোমাদের সত্য সত্যই অত্যন্ত ভাগ্য খারাপ কিম্বা বলতে পারো আমাদের ভাগ্য ভালো, যে, চীফ্‌ আমাকেই এই কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই একটি জায়গাতে তোমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছো, তোমরা আমাকে ধরতেই পারোনি। আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারছিলাম তোমাদের ঠোঁট নাড়া দেখে। আমি এই ভাবেই কথা বুঝ্‌তে অভ্যস্ত, কারণ আমি কানে একেবারেই শুনতে পাই না—বদ্ধ কালা!!!"

নির্জলা বিজ্ঞান

অজিত কুমার বর্ধন

সর্দির নতুন আবিষ্কার

সর্দি আমাদের কষ্ট তো দেয়ই, আবার সময়ও বেশ খানিকটা নষ্ট করে দেয়। শুধু নাককেই কষ্ট দেয় না, গলা, শ্বাস-প্রশ্বাস নালী ও বুকেরও অনেক রোগ সৃষ্টি করে। একই ভাইরাস এইসব রোগ সৃষ্টি করে কি না, তা আজও জানা যায় নি। তবে নাকের ভাইরাসের কথা বিজ্ঞানের কাছে ধরা পড়েছে।

ভাইরাস নানা জাতের হয়। মিক্সোভাইরাস অনেকটা ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা-ভাইরাসের মতো। শিশুরাই এতে ভোগে।

রিনোভাইরাস নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে ছোট-বড়ো সকলেই ভোগে। রক্ত একরকমেরই য়্যান্টিবডি (সংক্রমণ প্রতিরোধ শক্তি) তৈরি করে; কিন্তু রিনোভাইরাস আছে পন্‌চাশ রকমের। তাই বার বার সর্দি হয়।

গলাব্যথা, সর্দি ও নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী গোলিওভাইরাস ও য়্যাডেনোভাইরাস।

সর্দি হয়েছে, এমন অনেক লোকের ভেতরে আবার কোনো ভাইরাসেরই খোঁজ পাওয়া না। কি শীতের দেশ, বা কি গরমের দেশ, সর্বত্রই সর্দির ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। মাটিতে পড়লেই সর্দির ভাইরাসগুলো মারা যায়, কিন্তু $\frac{1}{10}$ ভাগ বায়ুর সংগে মিশে যায়।

রিনোভাইরাস কিন্তু য়্যানটিবডিকে কাবু করতে পারে না। টিকা দিয়েও মানুষের ভেতরে য়্যান্টিবডি তৈরী করা হয়। সেক্ষেত্রে শতকরা চারজন মাত্র সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে, দেখা গেছে। আজ পর্যন্ত যথেষ্ট প্রতিষেধক খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মমি করার কৌশল

এতোদিন আমরা জেনে এসেছি যে, মমি করার কৌশল শুধু প্রাচীন মিশরেরই জানা ছিল। লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও সাইবেরিয়ার কয়েকজন প্রত্নতাত্বিক সাইবেরিয়ার ইয়েনিসেই নদীর দক্ষিণ দিকে মাটি-খোঁড়ার কাজ চালিয়ে প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো অনেক প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শবদেহকে মমি ক'রে রাখার কৌশল পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রচলিত ছিল।

আবিষ্কৃত জিনিষগুলো হ'লো—শকযুগের প্রাচীন কবর, কাঠের কুঁড়েঘর, সোনার ও ব্রোন্জের অনেক জিনিষ, একটি মেয়েছেলের মমিকরা হাত, পাথরের তীরের ফলা (গায়ে এক প্রাচীন যোদ্ধার লেখা) ইত্যাদি।

অষ্টম্ শতাব্দীতে একটা তুর্গ-নগর ছিল। যাযাবর্রা সেটা ধ্বংস করে দেয়। সেটারও সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। খুব শিগ্গীরই এখানে একটা জল-বিদ্যুতের কারখানা গড়ে উঠবে।

চা একটি ওষুধ

চায়ের মধ্যে শক্তিশালী ভিটামিন যুক্ত এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে, যা দিয়ে শিশুদের পক্ষঘাত বা পোলিও, কঠিন বাত, রেডিও য়্যাক্টিভিটি-জনিত রোগ ও হাঁপানি সারানো যায়। ক্ষত বা রক্তপাতও বন্ধ করা যেতে পারে। রাশিয়ার কয়েকজন বিজ্ঞানী এটা আবিষ্কার করেছেন। কড়া চা পান করলে নাকি ব্লাডপ্রেশার কমে যায়।

সায়ান্স-ফিকশ্যন
তিন বছর আগে ও তিন বছর পরে

তিন বছর আগে 'আশ্চর্য !' প্রকাশিত হবার পরে ও তিন-বছর পরে এস. এফ. সিনে ক্লাব উদ্বোধনের তিনদিন পরেই সাপ্তাহিক 'দেশ' ও 'অমৃত' পত্রিকায় প্রতিক্রিয়া ঃ

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-কাহিনী লেখা হয় না কেন, কেনই বা এ বিষয়ে চর্চা করা হয় না, তা হয়ত অনেকের প্রশ্ন হতে পারে। ··· যে বাংলা দেশে কয়েকটা ভাল ডিটেকটিভ উপন্যাস অথবা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লেখা হল না সেখানে বিজ্ঞান-কাহিনীকে আশা করা বোধ হয় অতিরিক্ত প্রত্যাশা।" ···বিদুর, দেশ, ৩০. ২. ৬৩

"সাইন্স ফিকশ্যনের জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে। সম্ভবত আগামী দশ বছরে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তির মুখে যাবে এবং সাইন্স ফিকশ্যনের প্রতাপ বাড়বে।" ···বিদুর, দেশ, ২৯. ১. ৬৬

* * * *

বিজ্ঞানের কাজ বিশ্লেষণ আর সাহিত্য করে সংশ্লেষণ। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য যেন দুধকাটানো ছানা দিয়ে তৈরি সন্দেশ। 'আশ্চর্য' এই নতুন মিষ্টান্নের জোগান দিয়ে লুব্ধ করে তুলেছে। এঁদের ভিয়ান অনির্বাণ থাক, এই আমার গায়ে-পড়া শুভ কামনা। ···জৈমিনি, ২৬. ২. ৬৩

আমার এক বন্ধু কিছুকাল ধরে সায়েন্স ফিকশ্যন নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছেন। গোয়েন্দা কাহিনীকে তিনি আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। আমরা যারা ঐ সব কাহিনীতে বিগলিত

শিহরিত, উচ্ছ্বসিত, তাদের তিনি বলেন নাবালক। কিম্বা নেহাৎ করুণা হলে বলেন সেকেলে! তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, গোয়েন্দা কাহিনী এখন ক্রম অবলুপ্তির পথে, এবং তাঁর শূন্য মসনদে জাঁকিয়ে বসেছে সায়েন্স ফিকশ্যন।

ঘটনার গতি যে সেইদিকেই, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সায়েন্সের সঙ্গে ফিকশ্যন মেশালে পরিণামে দেশের অনুচ্চ-শিক্ষিত সাক্ষর জনমণ্ডলীর বিজ্ঞানবোধই যেতে পারে গুলিয়ে।

বলা বাহুল্য, আমার এ-যুক্তি বন্ধুবরের মনে ধরেনি। পূর্ববৎ তিনি সায়েন্স ফিকশ্যনের ভজনা করে যাচ্ছেন। এবং এখন দেখতে পাচ্ছি, রীতিমত তিনি ভক্তবৃন্দও জুটিয়ে ফেলেছেন। মনের দুঃখে তাই আমি পৃথিবীর বেশীর ভাগে দুর্বলচিত্ত মানুষের মতোই তাঁদের দলে ভিড়ে পড়লাম। আর তারই ফলশ্রুতি নীচের রচনাটি। ...জৈমিনি, অমৃত, ২৯. ১. ৬৬

[জৈমিনি রচিত চিত্তাকর্ষক গল্পটি বারান্তরে পুনর্মুদ্রিত হবে 'আশ্চর্য!'র পাতায়—গল্পটির মজার ছবিগুলি এঁকেছেন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট শ্রীঅমল।—সম্পাদক।]

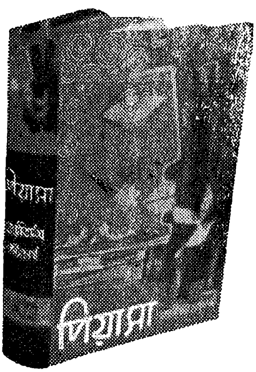

একটি
চমৎকার উপন্যাস
পিয়াসা
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
"প্রাণবন্ত"—যুগান্তর
দাম ৮৲ (ডাকব্যয় টা ১·১৩)

অ্যাল্‌ফা-বিটা ॥ ৯৭-১, সারপেনটাইন লেন ॥ কলিকাতা ১৪

তারার সীমানা ছাড়িয়ে

অনাময় চট্টোপাধ্যায়

পূর্বাভাস

১৯৭০ সালের জানুয়ারীর এক সকলে। ছুটির দিন তাই আড্ডা যথারীতি জমে উঠেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিমানীশের হাতে একটা মাসিক 'আশ্চর্য!' পত্রিকা। তাতে প্রকাশিত একটি সায়ান্স ফিকশনকে উপলক্ষ্য করেই আজকের তর্কের তুফান উঠেছে। হিমানীশের মতে সায়ান্স ফিকশন অন্ততঃ এমন হতে হবে যার বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা আছে—নিছক কল্পনাবিলাস নয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি উপন্যাসের ঘটনাগুলি শুধু আমাদের নয়—কোন স্পেস টাইম কন্টিনিউয়ামে হতে পারে না। স্রোডিংগার-এর থিয়োরী যদি সত্যি বলে মানি তাহলে·····। হিমানীশ আর আগাতে পারেনি, রিসার্চ স্কলার অমিয় বলে উঠেছে "চুলোয় যাক স্রোডিংগার। বিজ্ঞান কি করতে পারে সে বিষয়ে আজ বিজ্ঞানও কিছু বলতে পারে না। ধর না কেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন তোমার মতো পদার্থবিদদের ধারণা ছিলো, যা কিছু জানার সব তারা জেনে ফেলেছে। এখন শুধু দরকার আরও সূক্ষ্ম মাপজোকের জন্যে কিছু যন্ত্রপাতি। কিন্তু মাইকেল অন মরলির এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিলো তাদের মূঢ়তা। জন্ম নিলো নূতন ভাবধারার। ভেঙ্গে গেল ক্লাসিকাল মেকানিকসের বহু যত্নে বহুদিনের গড়া সৌধ। নতুন ইমারতের ভিত্তি স্থাপনা করলেন ফিটজেরাল্ড এবং লোরেঞ্জ। ইঁটের পর ইঁট গাঁথলেন মহর্ষি আইনষ্টাইন। স্রোডিংগার নিলেন ষ্ট্রীমলাইন করার ভার।"

ঐ তর্কের শেষ নেই আর শেষ পর্যন্ত পৌছলোও না। সশব্দে একটা 'স্বরাষ্ট্র বিভাগ' ছাপ মারা জীপ এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। সামরিক পোষাক পরিহিত জনৈক ব্যক্তি গাড়ী থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, "অরুণাভ চ্যাটার্জী কার নাম ?"

আমি এগিয়ে গেলাম। বেশ একটু অবাক হয়ে। কোন মিলিটারী পুলিশের ধারে কাছে যায়নি। কি রকম একটু ভয় বরাবরই ছিলো—এখনও আছে। তাছাড়া কিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেও এমন একটা কেউকেটা এখনও হয়নি যে এই ছুটির দিনেও স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আমায় খোঁজাখুঁজি করা হবে।

সামরিক ব্যক্তিটি জানালেন যে আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কিছু গোপনীয় কথা আছে যা বাড়িতে বসে বলা সম্ভব নয়। তাঁর সঙ্গে যদি জীপে চড়তে রাজী হই তাহলে চলন্ত গাড়ীতে বসেই সে সব কথা তিনি জানাবেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের পাড়ার ইন্সপেক্টরবাবুও ছিলেন। তাঁর অভয়বাণী নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। ইন্সপেক্টার আর গাড়িতে চড়লেন না। খুব সম্ভবতঃ তিনি আমায় চিনিয়ে দিতে এসেছিলেন। গাড়ীতে আমরা দুজন প্রাণী।

মহানগরের রাজপথ দিয়ে উল্কা গতিতে জীপ চালাতে চালাতে সামরিক ব্যক্তি তাঁর পরিচয় জানালেন এবং তাঁর পরিচয় পত্রও দেখালেন। বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কি দরকার থাকতে পারে। বিস্ময়ের আরও কিছু বাকী ছিলো। আমরা তখন বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলেছি ব্যারাকপুর এয়ারপোর্টের দিকে। আমাকে এখনই দিল্লী যেতে হবে। প্লেন প্রস্তুত এবং দিল্লী থেকে আবার লম্বা সফরে বার হবে। সামরিক কর্মচারী সবিনয়ে আরও জানালেন আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি যদি স্বেচ্ছায় যেতে না চাই, তাহলে আমাকে জোর করেই নিয়ে যাওয়া হবে

এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও তাঁর কাছে আছে। কেন আমায় দিল্লী যেতে হবে বা দিল্লী থেকে আমায় কোথায় যেতে হবে তা তিনি জানেন না তবে আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই আমার সহযোগিতা প্রয়োজন। স্বয়ং পুলিশ কমিশনার আমার বাড়ীতে গিয়েছেন এবং বাড়ীর সকলকে আমার আকস্মিক অন্তর্ধানের খবর তিনি জানাবেন এবং আমার কাগজপত্র এবং জামাকাপড় নিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছাবেন।

ব্যারাকপুর এয়ারপোর্টে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো একটি সুপারসনিক জেট প্লেন। আমাকে অভ্যর্থনা করে যিনি প্লেনে ওঠালেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত পরিচয় না থাকলেও খবরের কাগজের পাতায় তাঁর ছবি অনেকবার দেখেছি। শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে উড়ে যেতে যেতে তাঁর কাছ থেকে সব কিছু জানতে পারলাম। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কিছু গোপন খবরাখবর আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পেরেছেন। তাঁরা জেনেছেন যে ঐ রাষ্ট্র রাশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ইভানভের গোপন ল্যাবরেটরী ধ্বংস করার জন্যে তৈরী হচ্ছেন এবং ডাঃ ইভানভ এবং তাঁর বহু সাধনার জ্ঞান ভাণ্ডার রক্ষা করবার জন্যেই ডাক পড়েছে আমার। ডাঃ ইভানভ এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা যে কোন রাষ্ট্র অমিত শক্তির আধার হতে পারে। কিন্তু শান্তিকামী সোভিয়েট রাশিয়া যদি শক্তিশালী হয়ে পড়ে তবে তার নিকটবর্তী আর একটি রাষ্ট্র, যারা সমগ্র বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, তাদের উচ্চাভিলাষ ব্যর্থ হবে এবং এই কারণেই ডাঃ ইভানভের ল্যাবরেটরী রক্ষার ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্র নেতারা সচেষ্ট হয়েছেন।

"কিন্তু এজন্যে আমাকে পাঠানো হচ্ছে কেন? রাশ্যান এমব্যাসীতে খবর দিলেও তো হতো অথবা ওয়ারলেসে খবর পাঠালে অনেক তাড়াতাড়িই প্রতিবিধান হতো।"

[এরপর ১২১ পৃষ্ঠা দেখুন]

রেডিও প্রোগ্রামে 'আশ্চর্য !'র লেখকরা

১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত আটটায় হচ্ছে সেই 'অত্যাশ্চর্য' অনুষ্ঠান—কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত দ্বিতীয় সায়ান্স-ফিকশ্যন কাহিনী।

প্রথমবারে হাজির ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র,, অদ্রীশ বর্ধন, আর দিলীপ-রায় চৌধুরী। সেবারের অনুষ্ঠান এত ভালো হয়েছিল যে শ্রোতাদের অনুরোধে তা আবার টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়।

এবার থাকছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, অদ্রীশ বর্ধন এবং দিলীপ-রায় চৌধুরী। একই গল্প ধারা রক্ষা করে লিখেছেন পর পর চারজনে, পড়ছেন চারজনে।

এই প্রসঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে সেদিন সত্যজিৎ রায় বললেন তাঁর জনৈক আত্মীয়কে—"ব্যাপার আর কিছুই নয়, সায়ান্স-ফিকশ্যনকে হাওয়ায় আনার চেষ্টা চলছে !"

আগেরবারের গল্প এবং এবারের গল্প যথাসময়ে 'আশ্চর্য !'র পাতায় প্রকাশ পাবে।

ফ্রী বিনামূল্যে

২৫০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ উপন্যাস !

গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ
মনোরঞ্জন দে
"আশ্চর্য !" পত্রিকার
বার্ষিক গ্রাহক (৯৲)
হলেই পাবেন।

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌
৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৩

এস এফ সিনে ক্লাবের

রাত বারোটায় শেষ হল স্যুটিং। পরের দিন ভোরবেলা টেলিফোন এল। অদ্রীশ বর্ধনের জোর তাগিদ—ক্লাবের প্রতীক আজই করে দিতে হবে।

এতটুকু বিরক্তি নেই সত্যজিৎবাবুর কণ্ঠে। বললেন—"বেশ, করে দেবো। সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যাবে।"

আর একদিন। ভোরবেলা ফোন করতেই বললেন—"আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি—ফিরতে সেই সন্ধ্যে। সাতটার সময়ে দেখা করবে।"

. সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সপরিবারে বসে রাত আটটা পর্যন্ত হাসিতামাসা করতে করতে অদ্রীশ বর্ধনের সামনেই কয়েকটি খসড়া এঁকে দিলেন সত্যজিৎবাবু।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সেই আসরে হাজির ছিলেন। দেখেশুনে ওঠবার সময়ে এস,এফ, সিনে ক্লাবের সভ্য হয়ে গেলেন তক্ষুনি।

*

আর একদিন। দশটার সময়ে ফোন করলেন অদ্রীশবাবু—"মাণিকদা, আজকে বিকেলেই স্যুভেনিরের কভার ডিজাইন চাই।"

"পাঁচটায় এসে নিয়ে যেও।"

পাঁচ মিনিট পরেই ফোন এল সত্যজিৎবাবুর কাছ থেকে—"অদ্রীশ, কি সাইজ বললে ভুলে গেছি।"

আবার সাইজ বলা হল এবং যথা সময়ে বিকেলে পাওয়া গেল ডিজাইনটি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বৈদেশিক দূতাবাসের জনৈক প্রতিনিধি কভার দেখে মন্তব্য করলেন—"দিজ ইজ রে' স্পেশ্যালিটি। সিম্পল, বাট, বোল্ড।"

*

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দিন কয়েক আগে থেকে বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাস থেকে চিঠি আর ফোন আসা স্বরু হলো—অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণে জন্য ধন্যবাদ আর যোগ দেওয়ার আন্তরিক আগ্রহ জানিয়ে।

*

উদ্বোধন উৎসব

সভ্যসভ্যাদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ দেখা গেল কার্ড সংগ্রহের জন্য। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অফিস খোলা রাখতে হয়েছিল কার্ড দেওয়ার জন্যে—যাতে প্রত্যেক সভ্যসভ্যা সুবিধামতো যে কোন সময়ে কার্ডটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন। কারণ সভ্যসভ্যা তো কেবলমাত্র কলকাতাতেই নয়—কলকাতার বাইরে থেকেও অনেকে হয়েছেন। মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই ছ'শো সদস্য তালিকাভুক্ত হয়ে আরও শতাধিক আবেদনপত্র জমা পড়ে গেছে—সকলেরই বিশেষ অনুরোধ একটি আসন দেওয়ার—অন্ততঃ দাঁড়িয়ে দেখার সুযোগ পেতেও অনেকে চেয়েছিলেন!

২৬শে জানুয়ারী সকালবেলা অদ্রীশ বর্ধন ফোন করলেন প্রেসিডেণ্ট সত্যজিৎ রায়কে। "কখন আসছেন?"

"কেন, মিনিট পাঁচেক আগে।"

"তা কি করে হয়? অভ্যাগতরা আসবেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্যে—"

"ঠিক আছে, আগেই যাবো।"

সত্যজিৎবাবু এলেন ঠিক আধ ঘণ্টা আগে। সঙ্গে একমাত্র ছেলে বাবু।

বললেন—"আমার স্ত্রী পরে আসছেন।"

নিরিবিলিতে গ্রীণরুমে বসে থাকতে চাইলেন না উনি। এসে দাঁড়ালেন সভ্যদের মাঝে—পোর্টিকোয়। হাসি মুখে সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় শুরু করলেন। নিরহঙ্কার নিরভিমানী সেই ব্যক্তিটিকে দেখে তখন কে বলবে ইনিই বিশ্ববিখ্যাত 'রে'!

*

সাড়ে পাঁচটা বাজতে আর মাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড বাকী। সত্যজিৎবাবু এসে গেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রও এসে গেছেন। কিন্তু তখনো এসে পৌঁছোন নি প্রধান অতিথি তুষারকান্তি ঘোষ।

অসীম বর্ধনকে সত্যজিৎ বাবু বললেন—"একবার টেলিফোন করা দরকার।" অদ্রীশ বর্ধন টেলিফোনের দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে নামলেন তুষারবাবু এবং চিত্র-সাংবাদিক নির্মল কুমার ঘোষ।

অদ্রীশবাবু বললেন—"এইমাত্র যাচ্ছিলাম আপনাকে টেলিফোন করতে।"

ঘড়ি-পকেট থেকে সেকেলে ঘড়ি বার করতে করতে তুষারবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"কেন, এখনো তো সাড়ে পাঁচটা বাজেনি।"

তখন আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাকী!

*

হলের দিকে যেতে যেতে তুষারবাবু বললেন—"ছুটির দিনে নির্মলবাবুকে তো টেনে নিয়ে এলুম। উনি আবার ডেলি অ্যালাউন্স না চেয়ে বসেন।"

অট্টহাস্য করে উঠলেন আশপাশের সবাই।

চুরুট টানতে টানতে ঢুকলেন পাহাড়ী সান্যাল। অদ্রীশ বর্ধনের পিঠ চাপড়ে বললেন— "তোমার বুকের পাটা আছে—তাই এ জিনিস নিয়ে নেমেছো। কবে মেম্বার হচ্ছি বলো!"

*

বিশেষ আমন্ত্রণে উনি খুশী নন, সভ্য তাঁকে হতেই হবে। ২৬শে জানুয়ারীর জাতীয় উৎসব সন্ধ্যায় একাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে এস,এফ, সিনে ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি সত্যজিৎবাবু তাঁর স্বাগত ভাষণে যখন বলছেন, বিদেশে সায়ান্স-ফিকশ্যনের জয়জয়কার দেখে এদেশের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা, ঠিক তখন ফিসফিস করে তুষারবাবু প্রেমেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—"সত্যজিৎভায়া কোন্ কাগজের কথা বলছে?"

"আশ্চর্য!"

অদ্রীশ বর্ধন কে ডেকে এককপি 'আশ্চর্য!' আনতে বললেন প্রেমেন্দ্রবাবু। তুষারবাবু কপিটা হাতে নিয়েই বলে উঠলেন—"আরে, এ তো আমি কিনে পড়ি!"

*

সভাপতির ভাষণে শ্রীসত্যজিৎ রায় সায়ান্স ফিকশ্যন বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত ছায়াচিত্রের সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিজ্ঞানের যুগে এধরনের সিনে ক্লাবের উদ্যোগে দেশের নবযুগের সূচনা করলো। তিনি সায়ান্স-ফিকশ্যন সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী রূপে জুল ভের্ণ থেকে আধুনিক যুগের কিংসলী এমিস্ পর্যন্ত বহু লেখকের রচনা পাঠ করেছেন এবং বাংলাদেশে তথা ভারতে সর্বপ্রথম সায়ান্স-ফিকশ্যনের মাসিক

পত্রিকা "আশ্চর্য !" প্রকাশিত হওয়ার প্রথম থেকেই পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। "আশ্চর্য !" পত্রিকার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই অভিনব সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের পরিকল্পনাটির জন্য তিনি ঐ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সহ-সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ক্লাব-কর্মীদের আশীর্বাদ করেন এবং বর্তমান যুগে সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের উপযোগিতা আলোচনা করে বলেন, এই ক্লাবের মাধ্যমে নতুন ধরনের চিত্তাকর্ষক উদ্দীপনাময় ছায়াছবির প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এই ক্লাবের সদস্যগণ বর্তমানের গতানুগতিক ছায়াছবির ভিড়ে নতুন বিষয়ের ছায়াছবির অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাবেন।

উদ্বোধনী ভাষণে প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ আশা প্রকাশ করেন, শীগ্রি আমাদের দেশেও ভাল সায়ান্স-ফিকশ্যন ছায়াছবি প্রস্তুত হবে। তিনি বলেন, এই ক্লাবের যে উদ্দেশ্য বিদেশী সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিলমের মাধ্যমে নতুন রুচি সৃষ্টি করা তা নিশ্চয়ই সফল হবে এবং ফিলম শিল্পের এক নব অধ্যায় সুরু হবে। মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ ধরনের ফিলম প্রস্তুতের জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

ক্লাব-সম্পাদক শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি দেশের চিত্র প্রযোজকগণকে এদেশে সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিলম প্রস্তুতের বিপুল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান। এস,এফ, সিনে ক্লাবের প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতের সর্বপ্রথম সায়ান্স-ফিকশ্যন ও ফ্যানটাসি গল্পের পত্রিকা 'আশ্চর্য !'র পাঠক, লেখক ও কর্তৃপক্ষের চিন্তায় এই ধরনের ক্লাবের সম্ভাবনা ও উপযোগিতার কথা জাগে। অদ্রীশবাবু এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় (তিনি একজন দক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লেখকও বটে) ক্লাবের সভাপতি হন। এদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের পথপ্রদর্শক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ক্লাবের সহ-সভাপতি হতে রাজী হন। শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রত্যক্ষভাবে ক্লাবের ভিত্তি স্থাপনে কাজ করেছেন—ক্লাবের প্রতীকচিহ্ন তাঁরই পরিকল্পনা, তাঁরই হাতে আঁকা। সদস্য কার্ডের লে-আউট পরিকল্পনা করে দিয়েছেন, উদ্বোধনী স্মরণী পুস্তিকার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে।

সম্পাদকরূপে শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ করে, অতি অল্প দিনের মধ্যে রেজেষ্ট্রিকৃত সংস্থা রূপে ক্লাবটির মর্যাদা অর্জনের সুযোগসুবিধা করে দেওয়ার জন্যে তিনি শ্রীবি, কে, সোম, শ্রীসুধীররঞ্জন ভক্ত, এবং শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দিনরাত পরিশ্রম করে যাবতীয় ছাপার কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ছাপাখানাগুলি ধন্য- বাদাহ´। জে. ওয়ালটার টমসন, ইমপিরিয়েল টোব্যাকো, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, হিন্দুস্থান লীভার, স্ট্যানডার্ড ফারমাসিউটিক্যালস, বেঙ্গল ইমিউনিটি, জনতা ইলেকট্রিক, কৃষ্ণা ইলেকট্রিক, ইস্টার্ন রেলওয়ে প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন-দাতাগণ স্মরণী-পুস্তিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কলকাতা কালেক-টরেট দপ্তরের শ্রী এ. ঘোষ প্রমোদ কর রহিত সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। সবশেষে, সম্পাদক শ্রীবর্ধন প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের উপস্থিতি ও মনোজ্ঞ ভাষণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

*

মঞ্চ থেকে নামবার সময়ে প্রেমেন্দ্রবাবু বললেন—"অদ্রীশ, তুষারবাবু যাতে নিয়মিত 'আশ্চর্য !' পান, তার ব্যবস্থা করবে।"

সত্যজিৎবাবু হাসিমুখে বললেন—"তা হবে না। তুষারবাবুকে গ্রাহক হতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে কোটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা দশটাকার নোট টেনে বার করলেন তুষারবাবু।

সত্যজিৎবাবু হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন—"একি করছেন? আমি ঠাট্টা করছিলাম।"

"উহুঁ, আমি সবসময়ে কিনে পড়ি।" বললেন নাছোড়বান্দা তুষারবাবু।

প্রেমেন্দ্রবাবু বললেন—"সত্যি কথা, উনি সাহিত্যিকদের সবসময়ে এই ভাবেই সাহায্য করেন। আমার বইও উনি একেকবারে চার পাঁচ কপি কেনেন।"

অদ্রীশ বর্ধনের পাঞ্জাবীর পকেটে টাকা গুঁজে দিলেন তুষারবাবু। সত্যজিৎ-বাবু তখন বললেন—"ঠিক আছে, আমি যখন সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি তুলবো, আপনাকে টিকিট কেটে দেখতে হবে।"

এবারে সভ্যরাও হেসে ফেললেন!

*

তুষারবাবুকে একটি সজীব হাসির বোমা বললেই চলে। গম্ভীর প্রকৃতি সত্যজিংবাবু এবং প্রেমেন্দ্রবাবুকেও হল শুদ্ধ লোকের সঙ্গে হাসিয়ে ছাড়লেন তিনি। আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবের উদ্বোধন করার পরেই তিনি বললেন—"স্রেফ আমাকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র। ক্লাবের উদ্দেশ্য-টুদ্দেশ্য আগে থেকে পড়ে-টড়ে নিয়ে একটা বক্তিমে খাড়া করে আনলুম। কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হল সবার শেষে। সব্বার আগে সত্যজিৎ ভায়া দিলে আদ্ধেক বলে। তারপর সেক্রেটারীভায়া লম্বা ফিরিস্তি আউড়ে গেল—আমি পড়লুম মহা ফাঁপড়ে। আর কিছুই রইল না বলার। এইটা কি ঠিক হলো?"

*

মেট্রো-গোলডউইন-মেয়ারের বহুপ্রশংসিত "ভিলেজ অব দি ড্যাম্‌ড্‌" ছায়া-ছবি দিয়ে উদ্বোধনী-উৎসব সুসম্পন্ন হলো। ছবিটি সকলকে তৃপ্তি দিয়েছে, নতুন চিন্তার খোরাক দিয়েছে।

*

উদ্বোধন উৎসবে যাঁরা ছবি দেখার দিকে মন দিতে পারেন নি, কিন্তু খেটেখুটে অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেছেন, তাঁরা :—

রথীন বিশ্বাস, রমেন পাল, নিখিলেশ দত্ত, দিলীপ পালিত, রবিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত মিত্র, মানব দত্ত, সুখেন্দু দাস, ভবানী দাস, শ্যাম সুন্দর আগরওয়ালা, হেমন্ত চ্যাটার্জী ও কুমারী অপরাজিতা ভৌমিক।

*

শো-শেষ হলে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে পাহাড়ী সান্যাল আবার ধরলেন অদ্রীশবাবুকে—"এই নাও টাকা। আমাকে 'আশ্চর্য!' আর তোমাদের ক্লাবের মেম্বার করে নাও। আর নাও আমার অভিনন্দন!"

*

মধু বসু বললেন—"জানো বাবা, আসবার মত শরীরের অবস্থা আমার নেই। কিন্তু না এসেও পারলাম না।' মান্ধাতা আমলের ফর্মুলা তোমরা পালটে দাও—এমন একটা কিছু করো যেন সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন কিছু গড়ে ওঠে।"

*

মঞ্চে দাঁড়িয়ে তুষারবাবু বললেন—"ভেবেছিলুম, এদের তৈরী ছবি দেখব।

এখন যা শুনছি তাতে বুঝলুম, এরা বড় জবর ব্যবসাদার। আগে পরের তৈরী ছবি দেখিয়ে জমি তৈরী করবে। তারপর করবে নিজেদের ছবি।"

*

অদ্রীশ বর্ধন তাঁর ভাষণে যখন বললেন—"আমাদের বহুদিনের স্বপ্ন সেই দিনই সার্থক হবে যেদিন ভারতের সর্বপ্রথম সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্ম-ক্লাসিক আমরা পর্দায় দেখব—সে-ছবি তৈরী হবে এই কলকাতায়, তুলবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট, দুঃসাহসিক প্রতিভাবান শ্রীসত্যজিৎ রায়," .....ঠিক তখনি একদম সামনের সারি থেকে 'হিয়ার, হিয়ার' করে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন পাহাড়ী সান্যাল।

*

তুষারবাবু বললেন—"এমন একটা ছবি তোলা হোক, যে ছবি হবে আগামী দ্বাবিংশ শতাব্দীর কাহিনী। যা আজকে অসম্ভব মনে হবে, কিন্তু দুশ বছর পরে যা সত্য হবে। প্রেমেনবাবু রইলেন, সত্যজিৎ ভায়া রইল, এঁরাই করবেন সেই ছবি।"

*

সিট থেকে হাত বাড়িয়ে চট করে অদ্রীশ বর্ধনকে ধরে ফেললেন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট কাফী খাঁ।—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—"আপনি যে এতবড় কাণ্ড করে বসেছেন, তা ভাবি নি। অনেক মালমশলা জড়ো হয়ে রয়েছে মগজের মধ্যে। আপনাকে আমি ফোন করব, সব বলব, আমি আছি আপনাদের সঙ্গে।"

*

যুগোশ্লাভিয়ার কনস্যুলেট জেনারেলের প্রতিনিধি যাবার সময়ে বলে গেলেন —"দুবার দেখলাম, তবুও কত ভাল লাগল ছবিটা।"

*

বাড়ীতে বসে ঘরোয়া আলাপচারির সময়ে সত্যজিৎবাবু বললেন অদ্রীশ বর্ধনকে—"বিশ্বের সব সিরিয়াস ডিরেক্টররা এখন সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি তোলার দিকে ঝুঁকেছেন।"

*

গেষ্ট কার্ডের খসড়া এঁকে দিয়ে টাইপের নাম বলে দিয়েছিলেন সত্যজিৎবাবু। পাঁচ-পাঁচটা নামকরা টাইপ তৈরীর কারখানা খুঁজেও সে টাইপ পাওয়া গেল না।

এরপর স্যুভেনিরের টাইপ পছন্দ করার সময়ে ত্বতিন রকম টাইপের নাম বলে দিলেন সত্যজিৎবাবু, যাতে একটা না পাওয়া গেলে অপরটা পাওয়া যায়।

*

অনুষ্ঠানে প্রেমেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন সত্যজিৎবাবুকে—"অদ্রীশকে আপনি ক্যাটালগ না দেখেই টাইপের নাম আর পয়েণ্ট শুদ্ধ বলে দিয়েছেন শুনলাম। এত কাজের ফাঁকে এত টাইপের নাম মনে রাখেন কি করে?"

মুচকি হেসে সত্যজিৎবাবু বললেন—"আধুনিক বিজ্ঞাপনে টাইপই তো সবচাইতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। টাইপ নিয়ে অনেক দিন থেকেই নাড়াচাড়ি করি আমি, তাই ভুলতে পারি না।"

*

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই রাত্রেই পি.টি. আই. দিকে দিকে ছড়িয়ে দিলেন ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের নবতম উদ্যোগ সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের কথা। পরদিন ভোরবেলা বিশিষ্ট সংবাদ পত্রগুলিতে ছবি আর বিস্তৃত ডবল-কলাম খবরে লক্ষ লক্ষ লোক জানতে পারলো কলকাতার সায়ান্স-ফিকশ্যনসেবীদের ত্বঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা। কলকাতা বেতারেও ধ্বনিত হলো এই নতুন ফিল্ম ক্লাব সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা, আর শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ভাষণ। দিকে দিকে রটে গেল নতুন অভিযানের কথা!

*

আসতে স্বরু করলো নতুন সদস্য হওয়ার আবেদনপত্র,' আশ্চর্য!' গ্রাহক হওয়ার চাঁদা, অভিনন্দন বার্তা,······

···"ফিলমটি আমার খু-উ-ব ভালো লেগেছে। আপনাদের সহায়তায় আমি ক্লাবের সভ্যা, স্বতরাং এই আনন্দ উপভোগ করতে দেবার জন্যে আপনাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। এর পরে যে ফিল্ম দেখানো হবে তার গল্প ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিশ্চয়ই 'আশ্চর্যে!' দেখতে পাব। ক্লাবের দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং প্রাণভরে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"—জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, (সদস্য সংখ্যা ৭২১, বাগবাজার, কলকাতা।

"আমি ক্লাবের সভ্য নই, সেহেতু প্রেক্ষাগৃহের ভিতর যাইয়া অনুষ্ঠান দেখিবার স্বযোগ পাইনি। সেদিন ক্লাবের একটি 'স্যুভেনীর' ২৫ পয়সা দিয়া কিনেছিলাম। স্যুভেনীরটা সমস্ত দিক থেকেই আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে।

যদি আমার জন্য একটা সভ্য পদ খালি রাখিয়া দেন তাহলে আমি যারপর নাই উপকৃত হইব।"—প্রচিতাভ সিংহরায়, ভদ্রকালী, হুগলী।

"অনুষ্ঠানপর্ব বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করিলাম এবং পরে যে ছায়া-ছবিটি দেখান হল সেই ছবিটি দেখেও খুব ভাল লাগল। ছবিটি দেখে আমার ঐ ধরনের ছবি দেখার আগ্রহ বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে যখন পরের ছবিটি দেখান হবে আরম্ভের পূর্বে সে বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা রাখলে আনন্দিত হবো।"—ভবানীশঙ্কর মজুমদার (সদস্য সংখ্যা ৫৯), পাইকপাড়া, কলকাতা।

এস,এফ,সিনে ক্লাবের প্রতিষ্ঠায় সারা পৃথিবী উল্লসিত

ভারতের প্রথম, সম্ভবত বিশ্বের প্রথম, সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের প্রতিষ্ঠার খবর পেয়ে যাঁরা যাঁরা আনন্দ জানিয়েছেন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল। ক্লাব প্রেসিডেণ্ট শ্রীসত্যজিৎ রায়কে লেখা এঁদের চিঠিগুলি একে একে 'আশ্চর্য !'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ পাবে।

চিত্র প্রযোজক : ওয়াল্ট ডিসনী ॥ ডিসনী ল্যাণ্ড, ক্যালিফোর্ণিয়া
সায়ান্স-ফিকশ্যন লেখক : রে ব্র্যাডবুরী ॥ লস এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্ণিয়া
আর্থার সি ক্লার্ক ॥ লণ্ডন
কিংসলী অ্যামিস ॥ মেডা ভেল
ব্রায়ান অ্যালডিস ॥ হুইটলী, অক্সফোর্ড
বিদেশী রাষ্ট্রদূত: ডক্টর র‍্যাডিভোজ উভালিক ॥ যুগোশ্লাভিয়া
জ্যানোস ন্যাগি ॥ হাঙ্গারী
জ্যারোশ্লাভ কোহুট ॥ চেকোশ্লোভাকিয়া
জন ফ্রিম্যান ॥ বৃটেন
রোল্যাণ্ড মাইখেন্যার ॥ কানাডা
উইলিয়াম কে হিচকক ॥ আমেরিকা
ভারত সরকার : রাষ্ট্রপতি। উপরাষ্ট্রপতি।
প্রধান মন্ত্রী (তাসখন্দ যাওয়ার আগে)।
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (প্রধান মন্ত্রী হওয়ার আগে)।
পশ্চিম বংগ সরকার : রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী।
অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস : লেডী রাণু মুখার্জী

....

আগামী সংখ্যায় শ্রীসত্যজিৎ রায়কে লেখা ওয়াল্ট ডিসনীর চিঠি

....

সায়ান্স-ফিকশ্যনের উপকারিতা

আর্থার সি ক্লার্ক

[আর্থার সি ক্লার্ক শুধু বিজ্ঞানী নন, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকারও বটে। ইনি রয়াল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির সদস্য; বৃটিশ ইণ্টার-প্ল্যানেটারী (আন্তগ্রহ) সোসাইটির দু'দুবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। মহাকাশ ভ্রমণ এবং ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কিত তাঁর বহু নভেল সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বছর চোদ্দ আগে লেখক-বৃত্তিকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করার আগে ইনি নির্বিঘ্নে এরোপ্লেন মাটিতে নামার পদ্ধতির উন্নতি সাধনে সাহায্য করেন। একটা বিজ্ঞান পত্রিকার সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। চব্বিশ খানিরও বেশী বই ইনি এযাবৎ লিখেছেন। বয়স ৪৮। এখন থাকেন সিংহলে। বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী লিখে সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধনের জন্য ১৯৬২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিঙ্গ পুরস্কার গ্রহণ করার পর ইনি রাষ্ট্রসংঘে (ইউনেস্কো) একটি বিবৃতি দেন। নীচের রচনাটি সেই বক্তৃতার কিয়দংশ]

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে সায়ান্স-ফিকশ্যনের ভূমিকা কতটুকু? সায়ান্স-ফিকশ্যন থেকে অনেক সময় অনেক তথ্য জানা যায় বটে, কিন্তু আমার মতে সায়ান্স-ফিকশ্যন যত না শেখায়, তার চাইতে বেশী অনুপ্রেরিত করে এবং সায়ান্স-ফিকশ্যনের মূল উপকারিতা হল এই অনুপ্রেরণারই জোগান দেওয়া। ভর্ণ আর ওয়েলস-এর গল্প উপন্যাস পড়ে যে কত শত তরুণ-তরুণীর সামনে বিশ্বের বিস্ময় ভেসে উঠেছে এবং কত যুবক যুবতী বিজ্ঞানকেই জীবিকা করে নিয়েছে, তার হিসেব কে রাখে? পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক তাঁদের জীবনে স্বনামধন্য এই কাহিনীকারদের প্রভাব স্বীকার করেছেন। ঠিকমত সমীক্ষা করলে দেখা যাবে কাঁচা-বয়েসীদের বৈজ্ঞানিক জীবিকা গ্রহণের মূলে বৃহত্তম ভূমিকা রয়েছে সায়ান্স-ফিকশ্যনের।

বিশেষ করে একটি ক্ষেত্রে, জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে, সায়ান্স-ফিকশ্যনের প্রভাব বিপুল হয়ে দেখা দিয়েছে। মহাকাশে ভ্রমণের বিদ্যায় যে চারজন পথিকৃৎ, সেই জিওলকোভস্কি, ওবার্থ, গডার্ড আর ভণ ব্রণ ও তাঁদের ধারণা, তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের অনুমিতি প্রচার করার জন্যে সায়ান্স-ফিকশ্যনের শরণ

নিয়েছেন—যদিও সে সব গল্প সব সময়ে প্রকাশিত হয়নি।

মহাকাশ ভ্রমণের আইডিয়া প্রচার করে সায়ান্স-ফিকশ্যন নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীতে এক বিপুল পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, এই যে-বিশ্বে আমরা বাস করছি, এই ব্রহ্মাণ্ডেরই অদ্ভুত বাস্তব বোধ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে সায়ান্স-ফিকশ্যন। এই তত্ত্বই আরো ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে একটি রচনায়। রচনাটি আমার কাছে যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি কেবল সায়ান্স-ফিকশ্যন ভক্তই নন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ীও বটে। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর মূলার। উনি লিখেছেন "সত্যি-কারের তুনিয়াকে আর মানবজাতির ছেলেবেলার সেই ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বাগান বলে মনে হয় না। যতই দিন যাচ্ছে, ততই বিজ্ঞানেব চোখে যা ধরা পড়ছে, সেই দৃশ্যই প্রকট হয়ে উঠছে……আজকের ব্রহ্মাণ্ড অসাধারণ, অমিত-ব্যয়ী…বৃহত্তম এই যে তুনিয়ায় আমরা ক্রমশই প্রবেশ করছি, সেই তুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আশা আতংকের পূর্ণ ছবি যে আর্ট আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে না, সে আর্ট মৃত…কিন্তু মানুষ তো আর্ট ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই সায়েন্টিফিক যুগে মানুষ চাইবে সায়ান্স-ফিকশ্যন।"

ঐ একই রচনায় ডক্টর মূলার এই ধরণের সাহিত্যের আর একটি মূল্যবান অবদানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন! উনি লিখেছেন—"জাতি ধর্ম দেশ নির্বিশেষে সবাইকে সমান অধিকার, সমান শুভেচ্ছা, সমান সহযোগিতা দানের মস্ত সমর্থক হল আজকের সায়ান্স-ফিকশ্যন অর্থাৎ এস.এফ। এস, এফ, লেখক মাত্রই প্রায় অবিসম্বাদিতভাবে 'একটি মাত্র একতাবদ্ধ স্বাধীন পৃথিবী'র আদর্শে বিশ্বাস করেন।"

আমার মতে এ ছাড়া আর কোন পথও নেই। এই ধরণের সাহিত্য যাঁরাই পড়েন, তাঁরাই বর্তমান মানবজাতির উদ্ভট জাতিগত বিভেদের অসারতা উপলব্ধি করেন। মহাজাগতিক দৃষ্টিকে স্পষ্ট করে তোলে এস,এফ,। এই কারণেই যে সাহিত্যিক পণ্ডিতরা কোপারনিকাশের বিপ্লবকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি অথবা মানুষই এই ব্রহ্মাণ্ডে উন্নততম প্রজাতি এ তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারেননি—তাঁরা এস,এফ,-এর স্বাদ তেমন নিতে পারেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এঁরা নিজেদের শিক্ষিত করে তোলেন এবং জ্যোতিবিদ্যার অবিশ্বাস্য বাস্তবতা সম্বন্ধে নিজেদের সজাগ করে তোলেন, ততই তাঁদের

সম্বন্ধে পক্ষে মঙ্গল। আর সে কাজ চটপট করতে গেলে এস,এফ,-এর মত মোক্ষম যন্ত্র আর জুটি নেই।

নেই, কেন না, মূলগত ভাবে এ সাহিত্য হল পরিবর্তনের সাহিত্য এবং আজকের যুগে পরিবর্তনই হল একমাত্র জিনিস যা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান-বিপ্লবকে ধন্যবাদ জানাই। "সাহিত্যের মূলধারা" আমরা যে সাহিত্য বুঝি, তা সাধারণত স্থিরগতি সমাজের ছবি আঁকে। ঠিক যেন সময় প্রবাহে স্তব্ধগতি কোনো ছবি—চকিতে ক্যামেরার বুকে যা আঁকা হয়ে গেছে। এস,এফ, কিন্তু ঠিক তার বিপরীত ছবি আঁকছে। এ ছবিতে ধরেই নেওয়া হয়, অতীত থেকে ভবিষ্যৎ সবসময়েই সরে সরে যাচ্ছে। একেবারেই অন্য রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে। মনে করা গেলেও খুঁটিনাটি সহ সে ভবিষ্যৎকে নিখুঁত ভাবে আঁকা সব সময়ে সম্ভব নয়, আঁকার চেষ্টাও করা হয় না। এ প্রচেষ্টা অসম্ভব এবং মধ্যে মধ্যে ওয়েলস বা অন্যান্য লেখকদের অকস্মাৎ লক্ষ্যভেদের মূলে কপালজোর যতখানি আছে, ঠিক ততখানি আছে বিচার বোধ।

কিন্তু সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ তো বটেই, অন্যান্য অসম্ভব ভবিষ্যতের মানচিত্র এঁকেও সমাজের বহু উপকার করতে পারেন সায়ান্স-ফিকশ্যন লেখক। পাঠকের মনে তিনি নমনীয়তা সৃষ্টি করতে পারেন, পরিবর্তনকে গ্রহণ করা এমন কি স্বাগত জানাবার মত মনও সৃষ্টি করে নিতে পারেন। এক কথায়, যে কোনো পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মত সার্বজনীন মন এস,এফ, লেখকের কলমের গুণে সৃষ্টি হয়। আর এ যুগে এমনটিই তো সব চাইতে বেশী দরকার। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হয় নি বলেই ডাইনোসরদের অবলুপ্ত হতে হয়েছে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম না হলে আমাদেরও অবলুপ্ত হতে হবে। যে পরিবেশে মহাকাশপোত আর থার্মোনিউক্লিয়র অস্ত্রশস্ত্র এসে পড়েছে, সে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে না পারলে, আমরাও মুছে যাব এ পৃথিবীর বুক থেকে।

স্যার চার্লস স্নো তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ "সায়ান্স অ্যাণ্ড গভর্ণমেণ্ট"-এর শেষে 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভা'র ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উনি দেখিয়ে দিয়েছেন, অনেক মানুষের জ্ঞান থাকে, কিন্তু দূরদৃষ্টি থাকে না! তবে হয়ত আমরা, সায়ান্স-ফিকশ্যন লেখকরা, কখন-সখনো জ্ঞান ছাড়াই দূরদৃষ্টি দেখিয়ে ফেলি। আর যাই হোক, আমাদের দূরদৃষ্টি যে আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই দূরদৃষ্টিই একদিন দূরাগত সমাজের বুকে গিয়ে পড়বে।

[* সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণী পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত]

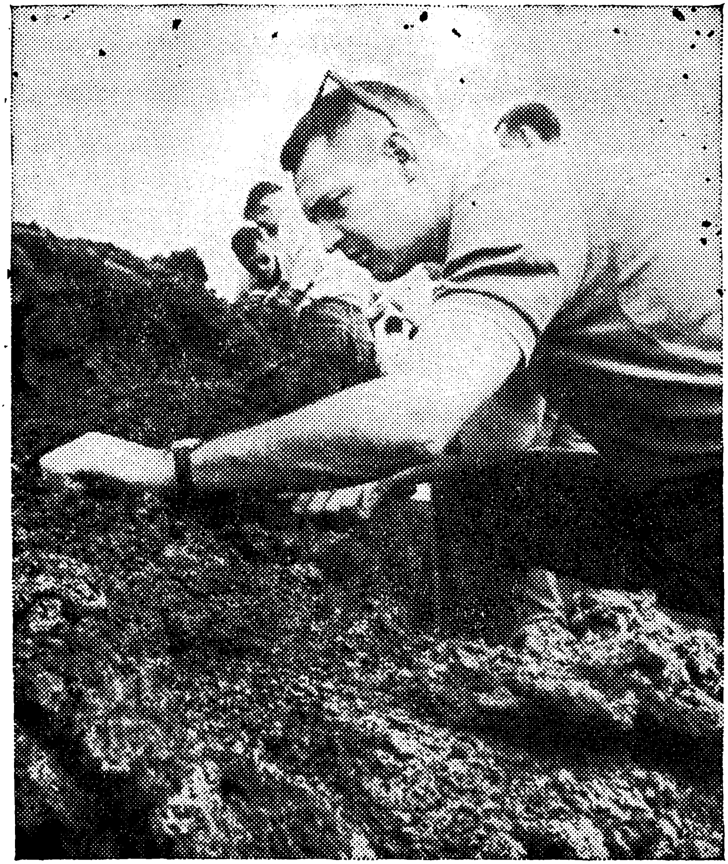

চাঁদের দেশে কেমন মাটি !

চাঁদের দেশে মাটি কেমন হবে তা-ই পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন ক্লিফটন উইলিয়ামস এবং আরো ক'য়েকজন মহাকাশচারী। চাঁদে গিয়ে নয়। হাওয়াই দ্বীপের ভলকানো ন্যাশনাল পার্কে ওরা অগ্নিগিরির সঞ্চিত লাভা পরখ করছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ভবিষ্যতে চাঁদে গিয়ে এই ধরণের মাটিই ওঁরা দেখতে পাবেন।

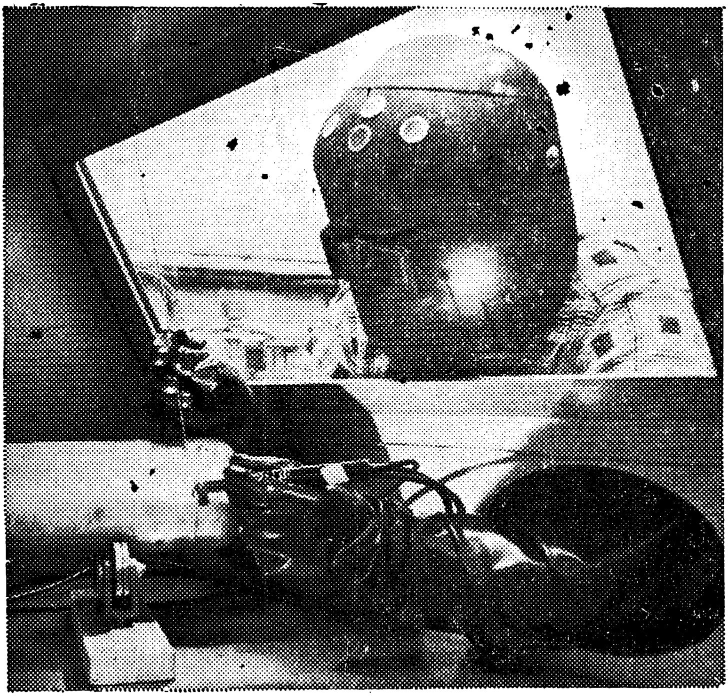

শূন্য-যোগ

কোলামবিয়াস'এর মত ধাতু, স্পেস এজে যার প্রচলন হবে আজকের অ্যালুমিনিয়মের মত, তা পুড়তে বা ঝালাই করতে একটা ভ্যাকুয়াম বাক্সের প্রয়োজন হয়। খোলা যায়গায় ধাতুটি ভাল জোড়া লাগে না কারণ হাওয়া অনুগুলিকে দূষিত করে তোলে। ছবিতে আমেরিকার রিপাব্লিক এভিয়েশন কম্পানীর এক কারিগরকে কোলামবিয়াম ঝালতে দেখা যাচ্ছে।

বেলুন-বিহার

ঘরে তৈরী হলে হবে কি, উঠেছিল ৩৭,৭০০ ফিট ওপরে, উড়েছিল দু'ঘণ্টা, নেমেছিল ৮০ মাইল দূরে। বেলুন বিহারী ট্রেবী বার্নেস মাটিতে নেমে সাতটা বিশ্ব রেকর্ডের দাবী জানিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নিবাস আমেরিকার মিনেআপোলিস'এ। বেলুনের তলায় যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সে জায়গাটাকে গণ্ডোলা হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কালো ব্যাগটার মধ্যে আছে অক্সিজেন। সব কিছু তাঁর নিজের হাতে তৈরী।

[১০৪ পৃষ্ঠার পর]

"না হত না। তার কারণ আমরা সে খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এমব্বাসাডার দেমিদককে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সংবাদ পাঠাবার পূর্বেই তিনি এবং তাঁর সহকারীর গুলীর আঘাতে নিহত হয়েছেন। এখন বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই যে, কেন এ খবর ব্যাপারে এত গোপনীয়তা রাখা হচ্ছে। রাশ্যান এমব্যাসীর আর কাউকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে সেখান থেকে বেতারে কোন খবর বাইরে পাঠানো না যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর ওয়ারলেসের কথা বলছেন—যে চেষ্টা ত আমরা করেছি কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী কোন ট্রান্সমিটার দিয়ে আমাদের ট্রান্সমিসন জ্যাম করে দেওয়া হয়েছে। আপনাকে পাঠানো হচ্ছে বিবিধ কারণে। প্রথম কথা, আপনি কিছুদিন আগেই রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছেন এবং আবার রাশিয়া যাবার প্রয়োজনীয় বা বৈধ ভিসা আছে। পাশপোর্টের জন্য অবশ্যই আপনার কোন অসুবিধা হবে না। দ্বিতীয়ত আপনি ডাঃ ইভানভের ছাত্র এবং তাঁকে ও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে বাঁচাবার আন্তরিক চেষ্টাই আপনি করবেন। এবং তৃতীয়তঃ ডাঃ ইভানভের গোপন ল্যাবরেটরীর অবস্থান এবং পথ আপনার জানা আছে। তাছাড়া ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করতেও আপনার কোন অসুবিধা হবে না কারণ এখনও আপনি ডাঃ ইভানভের একজনের সহকারী। যাক আর কথা নয়। আমরা পৌঁছিয়ে গিয়েছি। পালাম এয়ারপোর্টে আপনাকে প্লেন বদল করতে হবে। রাশিয়া থেকে শুভেচ্ছা সফরে কয়েকটি জেট প্লেন এসেছিলো দিল্লীতে, তারই একটাতে আপনাকে পাঠানো হবে।"

দিল্লীতে নেমে বিমান বদল করে একটি অতি আধুনিক ডাবল ডেল্টা প্লেনে চড়ে বসলাম। ছোট্ট পাতলা গড়নের এই জেট জঙ্গী বিমান ঘণ্টায় প্রায় হাজার মাইল গতিতে উড়ে চললো সাইবেরিয়ার এক প্রান্তে ইভানভের গোপন ল্যাবরেটরীর দিকে।

প্রেসারাইজড কেবিনে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম ডাঃ ইভানভের কথা। শক্তিশালী ইনজিনের চাপা মৃদু শব্দ অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

ডাঃ ইভানভ

ডা—ডা—ডা—ডি—একটানা সুরে একঘেয়ে আওয়াজ করে চলেছে দূরপাল্লার মাইক্রোওয়েভ রিসিভার। অসীম শূন্যে কোন অজানা গ্রহে প্রতিহত হয়ে আসছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ। ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড হয়ে চলেছে—তার ক্ষীণ কির কির আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। বিশালকায় রেডিও-টেলিস্কোপটার পাশে ছোট সাইজের এনালগ কম্পিউটার এর সাহায্যে জটিল গণিতিক সমস্যার সমাধানে সমাহিত ডাঃ ইভানভ —হাল্কা শাদা চুলগুলো মৃদু হাওয়ায় উড়ছে। আমার কথাটা তিনি শুনতেই পাননি মনে হচ্ছে। অবশ্য এও হতে পারে নিজের চিন্তায় তিনি তন্ময় হয়ে আছেন তাই আমার কথার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

"ডাঃ ইভানভ!" আমি আবার ডাক দিই।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন ডাঃ ইভানভ। তাঁর শান্ত সমাহিত চেহারা দেখে ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিলো যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর এই বিরাট ল্যাবরেটরী আর অসামান্য প্রতিভা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। গম্ভীর স্বরে বললেন ডাঃ ইভানভ, "তারা তাহলে আসছে? আসুক আমার আপত্তি নেই—আমি প্রস্তুত।"

"এখনও সময় আছে! রেডিও-টেলিফোনে আপনাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরে জানান। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ওদের ধ্বংস করা যাবে।"

"এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাব, তাই না?" ডাঃ ইভানভের কথায় চমক ভাঙলো। একটা পারমাণবিক বোমার

বিস্ফোরণ যদি হয় তা হলে আমরাও বাঁচবো না আর এই ল্যাবরেটরীও তার সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যাবে।

"তা হলে আপনাদের বিমান বাহিনীকে খবর পাঠান। মিসাইল দিয়েই ওদের ধ্বংস করা হোক।"

"আমাদের গোয়েন্দা দপ্তরকে অতো বোকা ভেব না।" ডাঃ ইভানভ আস্তে আস্তে বললেন, "ওরা আমায় ঠিক সময়েই জানিয়েছিলো। আমাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করতে তারা সব সময় প্রস্তুত। এমনকি আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ বলেই ভেবেছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ওপর ওদের কিছু কিছু বিশ্বাস এখনো আছে।"

"তাহ'লে আমি আপনাকে বলবার আগেই আপনি ওদের কথা জানতেন?" বেকুবের মতো আমি জিজ্ঞাসা করি।

"হ্যাঁ, ওরা সন্দেহ এড়াবার জন্যে ট্রেনে আসছে সে কথা আমি আগে থেকেই জানি। আরও জানি ওদের কাছে আছে ছোটপাল্লার গ্রাউণ্ড টু গ্রাউণ্ড মিসাইল। আমার ল্যাবরেটরী নষ্ট করতেই ওরা আসছে। বুদ্ধিটা অবশ্য ভালই। প্লেনে করে আসতে চেষ্টা করলে আগেই ওরা ধরা পড়তো। দূরপাল্লার- মিসাইলও ব্যর্থ হতো আমাদের এন্টি-মিসাইল মিসাইলের আঘাতে। তাই ওরা থেকে গোপনে আমাদের সীমানার ঠিক পাশেই লাবুজা গিরিপথ থেকে ছোটপাল্লার মিসাইল দিয়ে আমাদের পরীক্ষাগার ধ্বংস করবে ভেবেছে। টুরিস্ট ট্রেনের কয়েকজন নিরীহ যাত্রীকে কেউ সন্দেহ করবে না বলেই ওদের বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের। ওরাই হবে আমার এই বিরাট পরীক্ষার প্রথম পর্যবেক্ষক। অবশ্য বেঁচে থাকবে না ওরা।"

রাডার স্ক্রীনের থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই একনাগাড়ে কথা বলে চলেন ডাঃ ইভানভ, "এবারের বিপদটা কেটে গেলেই আমরা এই পরীক্ষাগার সীমানা থেকে আরও দূরে আরও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে

যেতে পারবো।"

"কিন্তু উপস্থিত এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন কি করে?" সত্যি কথা বলতে কি কোন উপায়ই আমি দেখতে পেলাম না। "জেট বিমান নয়, রকেট নয়, তবে কি আপনার ঐ একরাশ পুঁথি দিয়েই ওদের আটকাবেন না কি?"

আমার গলায় একটু বিরক্তির ঝাঁঝ পেয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন ডাঃ ইভানভ। "হ্যাঁ, এই কাগজপত্র দিয়েই উপস্থিত আমাদের বিপদ আমি আটকাবো। সোজা কথায় একটা ফাটল দিয়ে ওদের ঠেলে ফেলে দেবো অসীম শূন্যের বুকে। মঙ্গল গ্রহে ওরাই হবে প্রথম পার্থিব বস্তু। কিন্তু আর কথা নয়। ওরা প্রায় চলে এসেছে।"

উদগ্রীব হয়ে তাকালাম ডাঃ ইভানভের দিকে। রাডার স্ক্রীনে সবুজ আলোর ছুটোছুটি। প্রচুর ভালভ আর ট্রানজিষ্টার লাগানো একটা অদ্ভুত ধরণের যন্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লাল, নীল, হলুদ নানা রকম রঙের আলোয় ঘরটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো একবার। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর একে সব ভালভ কটাই নিভে গেলো। থেমে গেলো একটা বিজাতীয় আওয়াজ। রাডার স্ক্রীনের সবুজ রেখাটার ব্যস্ততা থেমে গিয়েছে—নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুরে যাচ্ছে রেখাটা।

"কিন্তু আর সময় নেই ডাক্তার, ওরা দুরন্ত বেগে এগিয়ে আসছে। আমাদের এখনই কোন ব্যবস্থা করতে হবে।"

মৃদু হেসে আমার দিকে তাকালেন ডাঃ ইভানভ। "হ্যাঁ দুরন্ত বেগেই যাচ্ছে ওরা, তবে আমাদের এখানে নয়—মঙ্গলগ্রহের দিকে।"

ডাঃ ইভানভের দিকে কি মাথা খারাপ হ'ল? আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি। "এখন আর পরিহাসের সময় নেই ডাঃ···।" বাধা দেন ইভানভ, "পরিহাস নয়। সত্যি কথাই বলছি। সত্যই ওরা মঙ্গল-গ্রহের দিকে দুর্বার গতিতে—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একলক্ষ ছিয়াশী

মাইল বেগে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"কিন্তু—"

"শোন বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপারটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। আজকের বিজ্ঞান বলে বাহ্যতঃ সব বস্তুই ত্রৈমাত্রিক হলেও প্রকৃতপক্ষে বস্তুমাত্রেই চতুর্মাত্রিক। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা ছাড়াও যে মাত্রা বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তা হচ্ছে সময়। গতি বা দূরত্ব বোঝাবার জন্যে আমরা যে সব এককের ব্যবহার করি তার প্রত্যেকটিই আপেক্ষিক। ঠিক এই যুক্তি অনুসরণ করে আমি দেখেছি যে মঙ্গলগ্রহ থেকে আমাদের পৃথিবী অনেক দূরে অবস্থিত হলেও আসলে পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব খুবই কম।"

মোটা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করেন ডাঃ ইভানভ।

"বুঝিয়ে দিলেই বুঝতে পারবে। তোমাদের দেশেরই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে কর তুমি হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছ পশ্চিম দিকে মুখ করে। তোমায় বলা হলো হাওড়া থেকে শেয়ালদার সোজাসুজি দূরত্ব বার করতে। হাওড়া থেকে সোজা পশ্চিম মুখে রওয়ানা হলে তুমি তারপর শেয়ালদায় এসে বললে এই দূরত্ব পৃথিবীর পরিধির সমান অথচ তার তুলনায় হাওড়া থেকে শেয়ালদার দূরত্ব কতটুকু! অনেকটা এই ধরণের ঘটেছে এখানে। লাবুজা গিরিপথেরই কোন এক অঞ্চল এই পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম আমি। সোজাসুজি পথে না গিয়ে যদি সময়ের গতির বিপরীত দিকে যাওয়া যায় তা হ'লে মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব কত তা জানবার জন্যে।"

চুরুটটা নিভে গিয়েছিলো। জ্বালিয়ে নিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করেন ডাঃ ইভানভ।

"কয়েকজন নিরীহ লোক অবশ্য মারা গিয়েছে কিন্তু তার জন্যে আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই। তোমাদের একজন মনীষী শঙ্করাচার্য বলে গিয়েছেন বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সব সময়ে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কিছু লোককে

আত্মদান করতে হবে বৈকী।

"আমি আগে থেকেই জানি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র চায় যারা পৃথিবীতে রাজত্ব বিস্তার করতে। আমরা এই ল্যাবরেটরীর ওপর তাদের নজর অনেক দিন থেকেই। আমাদের ধ্বংস করতে না পারলে ওদের জয়লাভ করা সম্ভব নয়। সমগ্র বিশ্ববাসীর উপরে যারা প্রভুত্ব করতে চায়—শান্তিকামী জনসাধারণকে যারা যুদ্ধের রক্তাক্ত পথে নামাতে চায় তাদের নিবৃত্ত করাই আমার সাধনা। দুটি মহাযুদ্ধ আমাদের দেশের লোকেরা দেখেছে। তারা আর যুদ্ধ চায় না কিন্তু তারা কারো অধীনতাও স্বীকার করবে না।"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন ডাঃ ইভানভ। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন "আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিলো। ট্রেনটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসা মাত্র রেলওয়ে লাইন কিছু উর্ধ-মুখী হয়ে যায় এবং ঠিক সেই সময়েই সময়ের গতি পরিবর্তন করা হয়। এই ভাবে সময়ের ফাঁক সৃষ্টি করে ঠেলে ফেলে দিয়েছি ট্রেনটাকে অসীম শূন্যে। ট্রেন তার সঞ্চিত মোমেণ্টামে এগিয়ে যাবে তার আপাতঃ সাধারণ গতিতে কিন্তু আমরা দেখবো সেটা বিদ্যুত গতিতে, আক্ষরিক ভাবেই বিদ্যুত গতিতে গিয়ে আছড়ে পড়বে মঙ্গল গ্রহের বুকে। সাধারণ গতিতে একটা মেল ট্রেন মঙ্গলে পৌঁছতে কয়েক হাজার বছর লাগলেও সময়ের দিক পরিবর্তনের ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা মঙ্গলে পৌঁছে যাবে।"

ডাঃ ইভানভ হাতের চুরুটটা ঘরের কোনে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। ঘর নিস্তব্ধ। ম্যাগনেটিক টেপ রেকর্ডারের একটানা কির-কির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন ডাঃ ইভানভ। মৃদু বাতাসে তাঁর হাল্কা শাদা চুলগুলো উড়ছে। জগতের শান্তিকামী জনগণের পক্ষ থেকে মনে মনে ডাঃ ইভানভকে প্রণাম জানালাম।

সে এক নতুন পারমাণবিক যুগের ছবি…

নিও-এ্যাটমিক এরা

কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য

"সাংস্কৃতিক মন্দিরের" মাসিক সভার আয়োজনেই ব্যস্ত ছিলাম। আইটেম ছিল অনেক, আবার সময় অল্প। সভার সামনে "সাংস্কৃতিক মন্দিরের" একমাসের রিপোর্ট পেশ করা, তারপর উদ্দেশ্য প্রচার করা, প্রথম আইটেম, এটা আমাকেই করতে হবে। দ্বিতীয়, ভাষণ। তার আবার পৃথক শাখা আছে যেমন, ভাষা, তারপর বিজ্ঞান, সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। এক একজন দিক্‌পাল এক এক বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবেন।

ধীরে ধীরে একে একে প্রায় সবই সম্পন্ন হ'ল। এবার প্রফেসার, ডাঃ কেবলরাম পুরকায়স্থ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছেন; মন দিয়ে শুনছি। তিনি বলে যাচ্ছেন—এ যে সভ্যতা দেখছি এ শুধু ভূমিকা। আসল সভ্যতা এগিয়ে আসছে পায় পায়। বিজ্ঞান নিজের শিখরে উঠেছে প্রতিদিন তার নতুন চমৎকারিত্ব দেখিয়ে, একদিন আসবে যখন যুদ্ধ থাকবে না, দ্বেষ থাকবে না, সমস্তই এক হয়ে যাবে আর সেটা হবে বিজ্ঞানেরই জন্য। সমস্ত কিছুই বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করবে। সেদিন হয়তো আসবে যখন মানুষ নিজের ইচ্ছামতই সব ঘরে বসেই পাবে। র‍্যাশনের জন্য লাইন দিতে হবে না। ডাক্তারের ক্লিনিকে ছুটতে হবে না। থারমোমিটারের মত একপ্রকার যন্ত্র হবে যার সাহায্যে টের পাওয়া যাবে শরীরে কোনটা প্রয়োজন, ক্যালসিয়াম না ভিটামিন। তারপর দোকান থেকে নিয়ে এসো সেই মত। শরীরের সমস্ত পার্টস ফারমেসীতে পাওয়া যাবে, ইচ্ছে মত বদলে নেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতি যখন এরকম হবে তখন কি আর কোনও

দেশ পৃথক থাকতে পারে ? সব এক হয়ে যাবে, সকলেরই সমান শক্তি সমান পুঁজি সমান জ্ঞান। তখন প্রাদেশিকতাও থাকবে না, ভাষার ঝগড়াও থাকবে না। হয়তো একটা ইন্টারনেশনাল ভাষা হয়ে যাবে। সমাজ ব্যবস্থা তখন হয়তো আরও উন্নত হবে। এসব কল্পনা নয়, এই সভ্যতাই আসছে, তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না এ উন্নতি, তবে আশা আছে আমাদের পরবর্তী কালের মানুষেরা এই সভ্যতায় লালিত পালিত হবে। সাংস্কৃতিক মন্দিরের যে উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ভাষাভাষীর মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক চর্চা আর নতুন সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা, তার সাফল্য কামনা করি।"

প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে ডাঃ কেবলরাম পুরকায়স্থ নিজের চেয়ারে বসলেন। এরপর সত্যকিংকর ভাসমালে, নরেন শিকদার, নিবেদিতা হালদার নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উন্নতির এবং তার পরিণতির বিষয়ে আলোচনা করলেন।

কান খাড়া করে শুনছিলাম একমনে। সভাভঙ্গের পর অতিথিরা একে একে চলে গেলেন আমরা সভ্যরা, এবং কর্মীবৃন্দরা একজোট হয়ে লাইট রিফ্রেশমেণ্টে যোগদান দিলাম। সঙ্গে উগ্র আলোচনা চলতে লাগল নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞান, ভাষা সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে।

আলোচনা স্তিমিত হয়ে এলে বাড়ী ফেরার জন্যে এগোলাম। শরীর কেমন যেন খারাপ লাগছিল। নিজের মনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আর আজকের আলোচনা ও ভাষণগুলো মনে মনে কপ্‌চাচ্ছিলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না, কি ভাবে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম, তারপরই সব অন্ধকার, শুধু এইটুকু মনে আছে যে দুটো-মটর সাইকেল বোধহয় পাশাপাশি আসছিল আর আমি তার মধ্যিখান দিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম।

কতক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম জানি না, ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু আলো ফুটে উঠছিল তারপর বেশ একটু পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

আমি পথের একধারে বসে আছি, বেশ দূরে দূরে অনেক স্ত্রী পুরুষ দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে একদৃষ্টে। ওরা সব কি এক অদ্ভুত ধরনের পোষাক পরে রয়েছে আমি তাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

ভীড়ের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে আসল আমার দিকে। তারপর ঘুরে ঘুরে আমায় দেখল। আমি হাত নেড়ে কাছে ডাকলাম। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে কি বললেন বুঝতে পারলাম না। এক অদ্ভুত ভাষা। আমি হিন্দীতেই বললাম, আপনার কথা আমি কিছু বুঝছি-না।

মনে হ'ল উনিও আমার কথা কিছু বুঝতে পারেন নি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন ভাঙা ইংরেজিতে, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমার কাছে সবই আশ্চর্য লাগছিল। চতুর্দিকে কেমন একটা বিরক্তিকর স্তব্ধতা। যেসব আগ্রহী স্ত্রী পুরুষ আমাকে দেখবার জন্য জমেছিল তারাও সব চলে গেছে। মাঝে মাঝে দু' একজন স্ত্রী-পুরুষ চোখে পড়ে, তাদের হাবভাব, চালচলন, পোষাক সবই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। আমি পরিষ্কার ইংরেজিতে উত্তর দিলাম। ভদ্রলোক বড় বড় চোখ করে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, আপনি ইংরেজি জানেন? সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললাম, আমার সবই কেমন একটা আশ্চর্য লাগছে, আপনাদের চালচলন পোষাক, হ্যাঁ, আপনি কোন ভাষায় কথা বলছিলেন তখন বুঝতে পারলাম না।

ভদ্রলোক উত্তর করলেন, ভারতীভাষা।

ভারতীভাষাটা আবার কি? আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, যে এলাকায় আমরা এখন আছি এটাকে বলা হয় ভারতবর্ষ, আর ভারতীভাষাটা আমাদের ভারতবর্ষের। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ গ্রহের থেকে আসছেন? বললাম, গ্রহ-ট্রহ কিছু বুঝছি না, মনে হচ্ছে আমারই গ্রহের ফের। একটু থেমে আবার বললাম, কিছু মনে করবেন না,

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনাদের ভারতীভাষা তো কখনও শুনিনি, সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা কত ভাষা ছিল। তাছাড়া সবই যেন কেমন খাপছাড়া লাগছে। এই আপনাদের পোষাকগুলোও দেখছি এক অদ্ভুত রকমের, মেয়ে পুরুষ সবাই এক আলখাল্লা পরেছেন আর কিশোর কিশোরীরা তো প্রায় সবই উলঙ্গ। এ কেমন ধারা বুঝলাম না। ভদ্রলোক একটু থামলেন, তারপর বলতে লাগলেন, আপনি ব্যাক্‌ডেটেড মনে হয়। এটা হ'ল নিও-এ্যাটমিক এরা (নব-পারমাণবিক যুগ), আর আপনি চিন্তা করছেন সেই ওল্ড এ্যাটমিক এরার। এযুগে সবই এ্যাটমিক এনার্জি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ পোষাকগুলোও এ্যাটমিক এনার্জি ?

ভদ্রলোক স্মিত হেসে বললেন, পোষাক কি ? সমস্ত, আমাদের শরীর, এমন কি ভাষাও। সবই ঐ এ্যাটমিক-এনার্জির ফল।

—ভাষা ? বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ভদ্রলোক একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, যখন এ্যাটমিক এনার্জিই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন, ভাষা বা পোষাকের প্রয়োজনটা কি ? আমার ঠাকুরদাদার কাছে শুনেছি তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ নাকি ওনার পিতামহের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে ভারতবর্ষে নাকি প্রায়ই লড়াই লেগে থাকত ভাষা নিয়ে। এর পরই তো সেই ভীষণ যুদ্ধ হয়। তখন এ্যাটমিক এনার্জি সবে চালু হচ্ছে। সেই যুদ্ধের পরই পৃথিবীর ধ্বংস হয়। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার ধীরে ধীরে নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। সেটাই হল নিও-এ্যাটমিক এরা, সমস্ত কিছুই এ্যাটমিক এনার্জি। এখন যুদ্ধও নেই, বিবাদও নেই, দুঃখও নেই অভাবও নেই।

আমি বলে উঠলাম, মাফ করবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এক এক করে বলুন। ভদ্রলোক আমার পাশে

বসে বলতে লাগলেন, এ্যাটমিক এনার্জি দিয়ে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ঠিক সেই ভাবেই আমাদের একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড পোষাক তৈরী করা হয়েছে, এগুলো বিজ্ঞানসম্মত একটা পোষাকেই মানুষ আজীবন কাটাতে পারে, তারপর সেটা অন্যে ব্যবহার করে।

ফস্ করে জিজ্ঞেস করলাম, বৃষ্টি পড়লে?

আমায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, বৃষ্টি কি? বুঝলাম এই নিও-এ্যাটমিক যুগে বৃষ্টি নেই। তাই জিজ্ঞেস করলাম, ফসল হয় কেমন করে? জল-সেচনের কি কোনও উন্নততর ব্যবস্থা হয়েছে? ভদ্রলোক যেন আশ্চর্য হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ফসলই বা কি আর জলসেচনই বা কি? আমার এবার কাঁদতে ইচ্ছে করল, এই কি নিও-এ্যাটমিক এরার সভ্যতা! মুখের কাছে ডান হাত দেখালাম, খাওয়া হয় কি? হাসলেন এবার ভদ্রলোক হো হো করে, তারপর বললেন, আপনি সেই ওল্ড এ্যাটমিক যুগেই রয়ে গেছেন। খাবার দরকার কি?

বুঝলাম পাগলের পাল্লায় পড়েছি। তাই চুপ করে রইলাম।

আমার অবস্থা দেখে ভদ্রলোক নিজেই বলতে লাগলেন, বছরে একবার এ্যাটোমাইসিন ইংজেক্সন দেওয়া হয়। দেশের নানা জায়গায় সব ওয়ার্ড রয়েছে, সেখানে গেলেই একটা ইংজেক্সান দিয়ে দেয়, বাস্।

আমি তো শুনে থ। তারপর বললাম, বেশ এ তো নয় হলো, কিন্তু আপনাদের ঐ ভারতীভাষাটা? ভদ্রলোক এবার বলতে শুরু করলেন, শুনেছি ওল্ড এ্যাটমিক যুগে নাকি বহু ভাষা ছিল আমাদের ভারতবর্ষে। সেই নিয়ে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। সবাই বলতো 'আমার ভাষাই ভাল, উন্নত, সারা দেশে আমার ভাষাই চালু হক,' এর পরই তো সেই

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল সারা পৃথিবীতে। সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেল। কতদিন ঐ ভাবে ছিল জানি না। তবে ধীরে ধীরে যে সভ্যতা গড়ে উঠল সেটাই হল এই নিও-এ্যাটমিক এরা। সেই সভ্যতার গোড়ায় যে কয়েকটা ভাষা তখনও ছিল, সেই সব ভাষা মিশিয়ে সর্বভারতীয় ভারতীভাষা হয়েছে। তবে আমাদের ভাষার কোনও দরকারও নেই। প্রত্যেক দেশেই—আমার মত কয়েকজন কর্মীদের বিলেতে পাঠিয়ে ইংরেজী ভাষণ শিখিয়েছে। আমাদের সব দেশে এবং গ্রহে আসা যাওয়া করতে হয় তাই এই অল প্ল্যানেটরী ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজী শিখতে হয়।

আরও কি সব বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ভাষার দরকার নেই কেন বলছেন? এখানকার লোকেরা লেখা পড়া, সাহিত্য চর্চা, চাকরি করে কিভাবে?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, ভাষা শিখেই বা কি দরকার! অযথা ব্রেইনকে চাপ দেওয়া ও আয়ু ক্ষয় করা। নিজের ভাবটা কোনও প্রকারে হাত পা নেড়ে প্রকাশ করতে পারলেই হ'ল। এ ছাড়া আমাদের জীবনের কোনও কিছুরই তো প্রয়োজন নেই।

বাধা দিয়ে বললাম, তাই বা বলছেন কেন? মানুষ তো একা নয়, তার স্ত্রী সন্তানও আছে, তাদেরও তো নানা সখ চাহিদা মেটাতে হয়, সে সবের জন্য অর্থের দরকার। তার মানেই চাকরি করতে হবে এবং অর্থ উপার্জন করতে হবে। তাহলেই লেখা-পড়া শেখা তার অনিবার্য।

ভদ্রলোক একটু স্মিত হেসে বলতে লাগলেন, আপনার অনেক কথারই মানে আমি বুঝছি না। তবে বুঝতে পারছেন না কেন, যে আমাদের দেশে এ্যাটমাইসিন ইংজেক্সন ফ্রি দেওয়া হয়। বছরে তো একটা ইংজেকসন দরকার। বছরের একদিন একটা ইংজেক্সন নিয়ে তারপর যত ইচ্ছে ঘুমাও ঘুরে বেড়াও। আর সন্তান, তারা তো দেশের। দেশই সব করে···।

আমি ফস করে বলে ফেললাম, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর নেই?

—ফ্যামিলি প্ল্যানিং কি? প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। বুঝলাম এই নিও-এ্যাটমিক যুগে প্ল্যানিংএর প্রয়োজন নেই। বললাম, ও আপনি বুঝবেন না। আপনি বলুন তারপর। জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, আমাদের কিছুই ভাবতেও হয় না, করতেও হয় না, দিনভোর সঙ্গিনীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াও, ফুর্তি কর।

আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার উৎসাহ ছিল না। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনও যান বা লোক চলাচল দেখলাম না। ধু ধু মাঠ, মাঝে মাঝে বাগান কি জঙ্গল বোঝা যায় না। বাড়ীঘর চোখে একটাও পড়ল না। মাঝে মাঝে পথের ধারে স্ত্রীপুরুষ মিলে বসে আছে, নয় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেমন অলস শান্ত, থম্‌থমে পরিবেশ। প্রাণ চাঞ্চল্য নেই কোনও। চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে যাবার জন্য ডাকলেন।

বেশ কিছুদূর যাবার পর একটা খুপরি মত ঘরে নিয়েগিয়ে হাজির হলেন। আরও কয়েকজন বসে ছিলেন সেখানে, আমার উপস্থিতি যেন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে ওঁদের মধ্যে। এর পর বেশ কিছুক্ষণ ওঁদের মধ্যে জোরে জোরে সব আলোচনা হ'ল, তার এক বর্ণও বুঝলাম না। বোধহয় ভারতী ভাষায় হচ্ছিল। তারপর একজন লালমুখো সাহেবের সঙ্গে আমার সঙ্গের ভদ্রলোকের বেশ রীতিমত তর্ক হ'ল। এটা ইংরেজীতেই হচ্ছিল। বুঝলাম আমার সঙ্গের ভদ্রলোক আমায় মিউজিয়ামে খাঁচায় বন্দি করে রাখতে চাইছিলেন। বলছিলেন একটা ওল্ড স্পেসিস্ মিউজিয়ামে থাক। সব দেশের আর গ্রহের লোকেরা এসে দেখবে। তারা আনন্দ পাবে দেখে একটা মনুষ্যাকৃতির জীবকে। এটা হবে আমাদের লেটেষ্ট ডিস্কভারি। কিন্তু লালমুখো সাহেবটা বেজায় রেগে উঠে উত্তর দিল, এ ব্যাড ইন্‌স্‌ট্যান্স, কিল হিম। ওকে দেখে সবাই ওর মত কাপড় চাইবে। ও সব গল্প করবে। তার মধ্যে

ইংরেজী জানে, তাতেই ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একটা ক্যাওস্ সৃষ্টি করবে। কিল হিম উইদ আউট ডিলে।

আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি উঠে দৌড়ে পালাতে গিয়েও পারলাম না। সবাই ধরে রেখেছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম।

একজন ঐ রকমই আলখাল্লা পরা লোক আমার সামনে এসে ধমকের সুরে বললেন, চেঁচাচ্ছেন কেন? তারপর পাশের লোকদের বললেন, ওকে শুইয়ে দাও।

সবাই জোর করে শুইয়ে দিল আমায়। তারপর একজন জোর করে একটা ইংজেক্সনের ছুঁচ ফুটিয়ে দিল আমার হাতে। আমি পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠলাম। হয়তো আরও চিৎকার করতাম কিন্তু নিতাই ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, ওরকম ভাবে চিৎকার করছেন কেন বলাইদা? চুপ করে শুয়ে থাকুন ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ভাল করে চেয়ে দেখলাম নিতাইএর দিকে। ঐ আলখাল্লা পরা ভদ্রলোক বললে ডিলিরিয়াস কন্‌কাশন অব দি ব্রেইন।

মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দোলা মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে এখন?

দোলার মুখের দিকে চেয়ে তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, নাঃ এটা ঐ অদ্ভুত নিও-এ্যাটমিক এরা নয়, হাসপাতাল। দোলার হাতটা ধরে চোখ বুজে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

ছোটদের ছড়ার রঙীন বই

ঝীল ঝিল

অজয় চক্রবর্তী

দাম টা ২.৫০

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

এস. এফ. সিনে ক্লাবের আগামী ছবি

ইউনিভার্সাল-ইন্টারন্যাশন্যালের

দি ইনক্রেডিব্‌ল্‌ শ্রিংকিং ম্যান

সংক্ষিপ্ত সচিত্র কাহিনী

নাম ভূমিকায় : গ্র্যান্ট উইলিয়াম্‌স্‌, র‍্যাণ্ডি স্টুয়ার্ট। পরিচালনা : জ্যাক আর্নল্ড। কাহিনী ও চিত্রনাট্য : রিচার্ড ম্যাথিসন। প্রয়োজন : অ্যালবার্ট জাগ্‌স্মিথ। ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফী : হলিশ কার্টার। স্পেশাল ফটোগ্রাফী : ক্লিফোর্ড ষ্টাইন।

সিনেমা হল : প্রিয়া, বালিগঞ্জ
তারিখ : মার্চ ২০, ১৯৬৬, রবিবার
সময় : সকাল ১০টা থেকে

গল্প

বিকেলের দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বোট নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে স্কট ক্যারি (গ্র্যান্ট উইলিয়ামস) আর তার বউ লুসি (র‍্যাণ্ডি ষ্টুয়ার্ট)। হঠাৎ একটা অদ্ভুত দ্যুতিময় কুয়াশা ভেসে এল বোটের দিকে। কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল নৌকা—কিছুক্ষণ পরেই দূরে মিলিয়ে গেল সেই আশ্চর্য কুয়াশা।

খুব ভয় পেয়ে গেছিল স্বামি-স্ত্রী। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই কিছুই আর মনে রইল না। তারপরেই ঘটল সেই ভয়ানক কাণ্ড!

কয়েক হপ্তা পরেই সভয়ে লক্ষ্য করল স্কট, তার ওজন কমে যাচ্ছে, মাথায় খাটো হয়ে আসছে—এক কথায় ছোট হয়ে যাচ্ছে সে—প্রতি হপ্তায় এক ইঞ্চি হিসেবে উচ্চতা কমে যাচ্ছে।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডক্টর টমাস সিলভার দেখলেন

কুয়াশার সংস্পর্শে আসার ফলেই স্কটের শরীরে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আসলে কুয়াশাটা ছিল রেডিও-অ্যাকটিভ (তেজস্ক্রিয়)। তাই, স্কটের শরীরকে বাড়তির দিকে না নিয়ে গিয়ে কমতির দিকে নিয়ে চলেছে। প্রতিষেধক আবিষ্কার করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন ডাক্তাররা। এ দিকে ক্রমশই বামন হয়ে যেতে থাকে স্কট।

স্কটের দুরবস্থার খবর সংবাদপত্র মহলে পৌঁছোয়। দেখতে দেখতে দেশ জুড়ে লোকের মুখে মুখে তার নাম ফিরতে থাকে। অনুরোধ উপরোধ এড়াতে না পেরে শেষকালে একটা পত্রিকার নিজের কাহিনী লিখতে রাজী হয় স্কট। তখন তার উচ্চতা মাত্র চার ফুট।

ডক্টর সিলভার একটা অ্যান্টিটক্সিন আবিষ্কার করলেন। ইঞ্জেকসন দিলেন স্কটকে। মনে হল ওষুধ ধরেছে। কিন্তু বেশিদিন রইল না সেই স্বস্তিবোধ। দুহপ্তা যেতে না যেতেই আবার পুঁচকে হয়ে যেতে লাগল স্কট।

তারপর উচ্চতা এসে দাঁড়াল মাত্র দুইঞ্চিতে। নিজের বাড়ীতেই একটা পুতুলের ঘরে বসবাস শুরু করল স্কট। একদিন লুসি বাজারে গেছে। সেই ফাঁকে বাড়ীর পোষা বেড়াল তাড়া করল স্কটকে। মনিবের তুলনায় তখন তাকে ছোটখাট পাহাড় বললেই চলে। তাড়া খেয়ে চোর কুঠরির সিঁড়ি বেড়ে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল স্কট। চোর কুঠরিতে ঠিকরে পড়ে জ্ঞান হারাল সে।

বাজার থেকে ফিরে এল লুসি। ভাঙাচোরা পুতুলের ঘর শূন্য দেখে বুক শুকিয়ে গেল তার। তারপর যখন স্কটেরই রক্তমাখা খুদে সার্টের ছিন্ন অংশ চোখে পড়ল, তখন সে ধরে নিলে স্কট মারা গেছে।

এদিকে চোর কুঠরির মধ্যে বন্দী হয়ে রইল স্কট। চোর কুঠরির সিঁড়ি তো নয়, যেন গ্রানাইটের খাড়া পাহাড়। দুইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে অনেক বিকট বিপদের সম্মুখীন হতে হল তাকে এবং

"THE INCREDIBLE SHRINKING MAN" (2-C)

আদিম মানুষের মতই অতি কষ্টে বেঁচে রইল সেখানে। খুদে একটা পিনকে বর্শার মত চালিয়ে মেরে ফেলল দানবিক চেহারার এক মাকড়শাকে। মাকড়শার ইচ্ছে ছিল স্কটকে ফলার করা—কিন্তু পিনটা থাকার ফলে প্রাণ গেল তার। আর একবার জল গরম করার পাত্রে ছোট্ট ফুটো হয়ে যাওয়ায় হুড়হুড় করে জল ঢুকে পড়ল চোর কুঠরিতে।

স্রেফ মাথা খাটিয়ে বেঁচে রইল সে। আরও ছোট হয়ে এল চেহারা। এত ছোট যে শেষকালে জানলার তারের জালতির ফুটো দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল স্কট। নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিধিলিপিকে মেনে নিলে সে। তখন তার উচ্চতা এক ইঞ্চিরও কম। স্কট জানে, আরও ছোট হবে সে। কিন্তু তাতে আর সে ভয় পায় না। ঈশ্বরের কাছে নাস্তি বলে কিছুই নেই। মনে মনেই বলে স্কট—"তবুও তো আমি রয়েছি বেঁচে, রয়েছে আমার অস্তিত্ব।"

কুড়ি ফুট লম্বা ইঁদুর কল

ছবিটা শেষ হয়ে যাওয়ার কয়েক হপ্তা পরে গ্র্যান্ট বলেছিল —"আবার আমি পুরো চেহারা ফিরে পেয়েছি বটে, কিন্তু খুদে হয়ে যাওয়ার আতংক বেশ কিছুদিন আমি ভুলতে পারব না। এরকম গায়ে-কাঁটা-দেওয়া অভিনয় কখনো করিনি। গোটা ছবিটা এমন ভাবে তোলা হয়েছে, মনে হয়েছে সত্যি সত্যিই ছোট হয়ে যাচ্ছি আমি।"

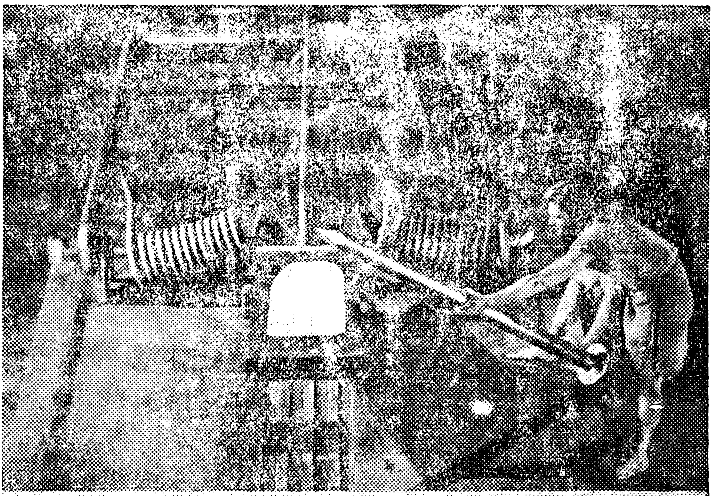

"THE INCREDIBLE SHRINKING MAN" (Z.D)

একটা দৃশ্যে খিদের জ্বালায় ইঁদুর কল থেকে খাবার চুরি করতে গেছিল গ্র্যান্ট। হঠাৎ কল পড়ে যেতেই মরতে মরতে বেঁচে যায় সে। তখন যে সে দুইঞ্চি লম্বা, তা দেখানোর জন্যে সেই অনুপাতে কুড়ি ফুট লম্বা ইঁদুর কল পাততে হয়েছিল। মোটা লম্বা রডটার এক ঘায়ে সেদিন দফারফা হয়ে যেত গ্র্যান্টের।

পাঁচ হাজার গ্যালন জলের তোড়

আর একটা দৃশ্যে চোর কুঠরির মধ্যে জল ঢুকে পড়ার ছবি তোলা

হয়েছে। ছবিতে দেখানো হয়েছে এত সামান্য জল যে স্বাভাবিক চেহারার মানুষের গোড়ালিও ডুববে না। কিন্তু দুইঞ্চি লম্বা গ্র্যাণ্টকে সেই জলে হাবুডুবু খাওয়ানোর জন্যে কত জল ছাড়তে হয়েছিল জানেন? বেশি না, মাত্র পাঁচ হাজার গ্যালন।

রাক্ষুসে মাকড়শা টারানটুলা

সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসের রাক্ষুসে মাকড়শার আদিবাড়ী অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকায়। ইউনিভার্সাল-ইণ্টারন্যাশন্যালেরই সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি 'টারানটুলা'তে দারুণ অভিনয় করেছিল সে। মালিক রালফ হেলফারের মতে সে ছাড়া পৃথিবীতে আর ট্রেনিং পাওয়া রাক্ষুসে মাকড়শা নেই।

এই মাকড়শাটাই দুইঞ্চি গ্র্যাণ্টকে আক্রমণ করেছিল বর্তমান ছবিতে।

বারো ফুট লম্বা পিন

মাস আষ্টেক ধরে ক্যামেরা আর স্পেশ্যাল ইফেক্ট ডিপার্টমেণ্ট অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করার পর শুরু হয় আসল ছবি তোলার পর্ব। টেকনিকের অভিনবত্বের জন্যে প্রথম থেকেই স্যুটিংয়ের সময়ে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। ষ্টুডিওর কর্মীরাও প্রবেশাধিকার পায় নি। অভিনেতাদের প্রত্যেককে বিশেষ প্রবেশ পত্র রাখতে হয়েছিল সঙ্গে। স্রেফ ব্যবসার খাতিরে এত গোপনতা রক্ষা করতে হয়েছে আগাগোড়া।

স্যুটিংয়ের বহু আগে থেকেই এক-একটা জিনিষকে এক-এক মাপে বড় করে বানাতে হয়েছে। কাউকে দ্বিগুণ, কাউকে চতুর্গুণ, কাউকে পঁচিশগুণ, এমন কি কয়েকটা জিনিষকে একশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে তৈরী করতে হয়েছে।

যেমন, ১২ ফুট লম্বা পিনটা। দুইঞ্চি উঁচু গ্র্যাণ্ট এই পিন বর্শার মত চালিয়েই লড়াই করেছে রাক্ষুসে টারানটুলার সঙ্গে। টিক ফটোগ্রাফীর বালাই নেই। গ্র্যাণ্টকে যখন সত্যি সত্যিই

বামন করা যাবে না, তখন তার চারপাশের সবকিছুই সেই অনুপাতে বড় করে দেখানো হয়েছে।

নায়ক এ ছবি দেখেনি

একবার মাত্র খানিকটা ছবি দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল গ্র্যাণ্টের। প্রোজেকসনরুমে ঢুকেই কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসেছিল সে। বলেছিল, "কি ভয়ানক। এভাবে নিজের ছোট হয়ে যাওয়া দেখা যায় না। এ ছবি আমি কখনো দেখব না।"

আতশ কাঁচের তলায় পোশাক তৈরী

ছ ফুট লম্বা গ্র্যাণ্ট হপ্তায় হপ্তায় ছোট হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আধ ইঞ্চিতে। ছ ফুট মানুষের পোষাকের তুলনায় আধ ইঞ্চি মানুষের পোষাক কত ছোট হতে পারে, তা দেখাতে গিয়ে খুদে পোশাকটা আতশ কাঁচের তলায় রেখে বানাতে হয়েছে।

আর এক সিসিল বি ডি মিলি

কাতারে কাতারে এক্সট্রা আর পাহাড় প্রমাণ সেট সাজিয়ে ছবি তুলে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন সিসিল বি ডিমিলি। কিন্তু জ্যাক আর্নল্ডও কম যান কিসে? বারোজনেরও কম লোক, পচা কেক; দেশলাইয়ের বাক্স, রঙের পুরোনো টিন আর পেরেক দিয়ে যেরকম এলাহিকাণ্ড দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। গল্পের যে অংশে গ্র্যাণ্টকে যতখানি ছোট করে দেখানো হয়েছে, সেই অংশের সেটের প্রতিটি জিনিস ঠিক ততখানি বড় করে বানাতে হয়েছে। বাড়ীর চোরকুঠরি যে কি বিশাল, তা দেখাতে গিয়ে সেটটাকে নটা পৃথক সাউণ্ড ষ্টেজের ওপর ছড়িয়ে দিতে হয়েছে। সবকটা একসঙ্গে জোড়া লাগালে সেটটা কত বড় হত জানেন? লম্বায় এক মাইল আর চওড়ায় পৌণে এক মাইল।

সবকিছুই এইরকম অতিকায় আকারে তৈরী করতে হয়েছে। যেমন, ৫৫ ফুট উঁচু রঙের টিন, ১৮ ফুট উঁচু পচা বাসি কেক, ২৫ ফুট

লম্বা কাঁচি, ৭ ফুট লম্বা পেরেক—সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি তুলতে গিয়ে বিপুল এই সরঞ্জাম নির্মাণের নজীর ষ্টুডিওর ইতিহাসে আর নেই।

আশ্চর্য এই ছবিই আপনাদের সামনে এবার হাজির করছে 'আশ্চর্য' পত্রিকার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাব।

আসছে। আসছে। আসছে।

এই শহরেই আসছে

এচ. জি. ওয়েলসের অন্যতম ক্লাসিক সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্ম

কলাম্বিয়ার

ফার্ষ্ট মেন ইন দি মুন

(চাঁদে প্রথম মানুষ)

রঙীন ছবিতে রঙীন কাহিনী। চাঁদের বুকে রাশিয়ার উপগ্রহ নামবার অনেক অনেকদিন আগে ওয়েলসের আজবযান পৌঁচেছিল চাঁদের বুকে আশ্চর্য প্রাণীদের রাজ্যে। তাদেরই বিস্ময়কর অভিযানের কাহিনী রূপায়িত হবে কলকাতার খ্যাতনামা হলে……আর সম্পূর্ণ উপন্যাসটা ? যারা পড়েননি—তাঁরা দিন গুনুন—'আশ্চর্য'র এক সংখ্যাতেই গোটা গল্পটাই শুনিয়ে দেবেন অদ্রীশ বর্ধন।

?

কে-কি-কেন-কবে-কোথায়

সংগ্রাহক : অজয় কুমার

চাঁদে পৌঁছানোর সন্ধানী রকেট ছোঁড়া কবে আরম্ভ হয় ?

চাঁদে রকেট পাঠাবার প্রথম চেষ্টা হয় রাশিয়ায়। ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী রাশিয়ানরা 'লুনিক-১' ছোড়ে, তবে সেটি চাঁদে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সূর্যের চারধারে ঘুরছে সেটি এখনও। এর পরে আমেরিকায় ১৯৫৯ সালের ১৭ই আগষ্ট আমেরিকানদের তৈরী 'পাইওনিয়ার-১' এবং পরে 'পাইওনিয়ার-৩' এই দুটি রকেট চাঁদে যাওয়ার চেষ্টার যথাক্রমে ৬৩,৫০০ এবং ৭০,৭০০ মাইল উঁচুতে ওঠে। রাশিয়ানরাও এই প্রচেষ্টায় সর্ব প্রথম সফল হয় ১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। তাদের 'লুনিক-২' রকেট ছোঁড়বার ৩৪ ঘণ্টা পরে সেটি মহাশূন্যে ২৩৬,১৬০ মাইল পাড়ি দিয়ে চাঁদে গিয়ে ধাক্কা মারে। চাঁদে যখন এটি পৌঁছোয়, তখন এটির গতি ছিল ঘণ্টায় ৭৩০০ মাইল! এরপর ৪ঠা অক্টোবর 'লুনিক' চাঁদের চারপাশে ঘুরতে থাকে। ১৯৬১ সালের ২৩শে আগষ্ট রেঞ্জার-১০ পাঠাবার পর মার্কিনরা এখন চাঁদের চারধারে নকল উপগ্রহ ঘোরানোর পরিককল্পনায় ব্যস্ত আছেন। আমেরিকা ও রাশিয়া পাল্লা দিয়ে চেষ্টা করছে মানুষকে চন্দ্রলোকে পাঠিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার জন্য।

৩রা ফেবরুয়ারী ১৯৬৬ সালে সোবিয়েত মহাকাশযান লুনা-৯ ধীরে ধীরে চাঁদে অবতরণ করে। পাঁচবার চেষ্টার পর রাশিয়ার এবারের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মহাকাশ প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হল।

বিড়াল জল দেখলে ভয় পায় কেন ?

বিড়াল জল দেখলে ভয় পায় এইজন্য যে, অন্য জন্তুর মত তার দেহের লোমে তৈলাক্ত কোনও পদার্থ নেই; অর্থাৎ সেটা জল নিরোধক (Waterproof) নয়। কাজেই অন্যান্য জন্তুর মত ভিজে গায়ের জল তারা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। জলে তারা ভিজে যায়, এই ভিজে যাওয়ার ফলে তাদের বড় শীত করে বা কষ্ট হয়। তাই তারা জল দেখলে ভয় পায়।

মশা মাছি ও ঝিঁ ঝিঁ পোকা যে ডাকে, তার শব্দটা কি ?

মশা মাছির ডাকটা আসলে তাদের ডাক বা মুখের শব্দ নয়, ওটা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শব্দ। মশার ডানার নীচে একজোড়া ডাম্বেলের মত একরকম প্রত্যঙ্গ আছে, যেখানে মশার ডানার আঘাত লেগে ঐ রকম শব্দ পিন্ পিন্ শব্দের সৃষ্টি হয়। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দটা হয় তাদের পায়ে পা-ঘষার শব্দ থেকেই। ঠিক যেমন বেহালাতে ছড়ি ঘষলে শব্দ হয়, তেমনি কাণ্ডই ঘটে ওদের পায়ে পা ঘষা লেগে—আর সেইটাই শুনি ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের আকারে।

আশ্চর্য !

আগামী সংখ্যায় থাকবে ঃ

পিশাচী

দেবব্রত চ্যাটার্জীর সম্পূর্ণ লোমহর্ষক উপন্যাস

রঞ্জন লাহিড়ীর গবেষণা থেকে জন্ম নিলো ভয়ঙ্কর করুণ কাহিনীটি !

ডাঃ চট্টোরাজের চটক

তিনি রোজ রাত্রে পূর্ণিমা ফুটিয়ে দিলেন···সৌরেশ দে রচিত ভারী মজার গল্প !

সহজ পঠন পদ্ধতি

সুরজিৎ চৌধুরীর গল্পটি পড়ে হাসি পেলেও হাসা যাবে না !

আমি মানুষ নই

পৃথিবী তার ঘর নয়, সে সম্মোহিত হয়ে ছিল···শ্রীহর্ষ মল্লিকের গল্প !

চাঁদ এবং গণিত

সুব্রত চক্রবর্তীর গল্পটিতে অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ হয়েছে চাঁদে প্রদক্ষিণটা স্বপ্ন !

পৌষ-চৈত্রের পরাজয়

গরমে পাখা-এয়ারকনডিশন কিছু দরকার নেই···শুধু চাই একটা আয়না ।

দুলাল পালের গল্প

আরো অনেক কিছু * দাম ৭৫ পয়সা * মার্চ ১৯৬৬

Published by A. Bardhan, Alpha-Beta Publications, 97-1, Serpentine Lane, Calcutta-14. Printed at Rupamudran, Calcutta-12.

এস,এফ, সিনে ক্লাবের উদ্বোধন

স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় আলোক চিত্র

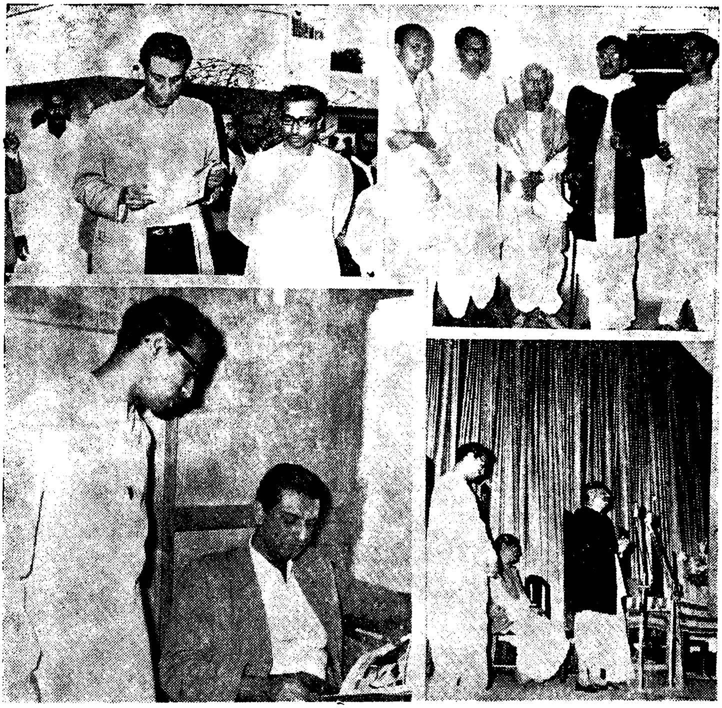

প্রথম সারি

প্রথম ছবি : অ্যাকাডেমিতে পৌঁছেই স্মরণী-পুস্তিকা নিয়ে আলোচনা রত সভাপতি সত্যজিৎ রায় এবং সম্পাদক, অদ্রীশ বর্ধন (ডাইনে) ; একদম বামে অন্যতম উদ্যোক্তা সুখেন্দু দাস। (পুস্তিকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন সত্যজিৎবাবু স্বয়ং)।

দ্বিতীয় ছবি : ছবির বিরামকালে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) কোষাধ্যক্ষ অজিত কর্মকার, কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য অসীম বর্ধন, চিত্র-সাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ, প্রধান অতিথি তুষারকান্তি ঘোষ ও অদ্রীশ বর্ধন।

দ্বিতীয় সারি

প্রথম ছবি : গ্রীণরুমে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে স্মরণী পুস্তিকা নিয়ে আলোচনারত সত্যজিৎ রায় ও অদ্রীশ বর্ধন।

দ্বিতীয় ছবি : মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছেন তুষারকান্তি ঘোষ। পাশে সহ-সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধন (দাঁড়িয়ে)।

Reg[illegible] C-118 * ASCHORJO ! * February 1966 * 75 Paise

যে ফিল্‌মটি নায়ক নিজেও দেখতে ভয় পেয়েছিলেন—

ইনক্রেডিব্‌ল্‌ শ্রিংকিং ম্যান

"THE INCREDIBLE SHRINKING MAN" (2-E)

কী এক রহস্যে নায়ক দিন দিন ছোট হতে হতে মাকড়সার চেয়েও ছোট হয়ে গিয়ে মৃত্যুর মুখে পড়েছিলেন ! একটি ভয়ঙ্কর ফিলম্‌ !

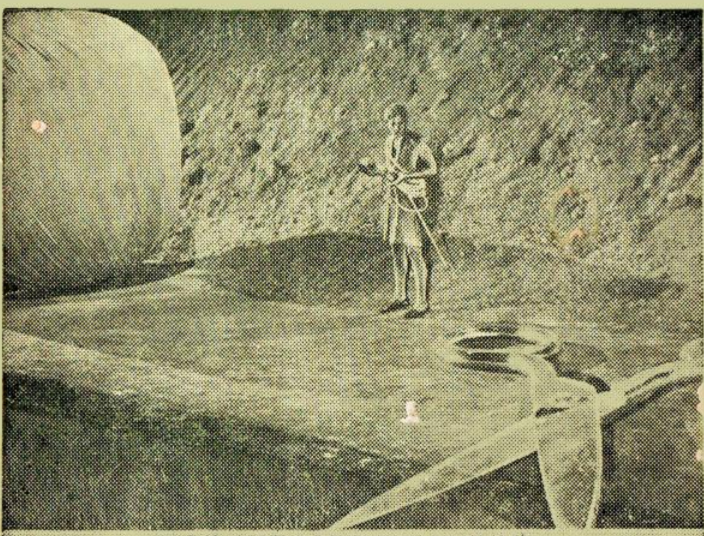

"THE INCREDIBLE SHRINKING MAN" (2-F)

এমন কি একদিন কাঁচির চেয়েও ছোট হয়ে গেলেন ! একটি আলপিন হলো তাঁর বর্শা ! ২০শে মার্চ সকাল ১০টায় 'প্রিয়া' সিনেমা হলে "সায়েন্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবে"র পরবর্তী অধিবেশনে ফিলমটি দেখানো হবে।